
কুটি মামার
বিজ্ঞান চর্চা
প্রদীপ্ত সেন
শিশু সাহিত্য সংসদ

কুট্টি মামার



বিজ্ঞান চর্চা

প্রদীপ্ত সেন

শিশু সাহিত্য সংসদ

KUTTYMAMAR BIJNANCHARCHA
(*Stories on environmental consciousness*)
by Pradipta Sen

ISBN-81-86806-80-6

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অলয় ঘোষাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০০

প্রকাশক
দেবজ্যোতি দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
নটরাজ অফসেট
১৭৯এ/১বি মানিকতলা মেন রোড
কলকাতা ৭০০ ০৫৪

মূল্য : টাকা ২৫.০০ মাত্র

প্রকাশকের নিবেদন

সংকলনের গল্পগুলি সবই বাস্তুসংস্থান বা ইকলজি বিষয়ে। সারা পৃথিবীতেই বিষয়টি আজ চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। আকাশ-বাতাস-জল-মাটি-জীবজঙ্গল নিয়ে সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির প্রশ্ন, এমনকী তার বাঁচা-মরার প্রশ্নটাও জড়িয়ে গেছে আজ। এ নিয়ে নতুন এক ধারণাও তৈরি হয়েছে যার নাম 'মানব বাস্তুসংস্থান' বা human ecology—সমাজবিজ্ঞানী ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী যৌথভাবে এই ধারণাকে ধরে কাজ করছেন।

মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে নিবিড় সম্পর্কটাকে ইটগাথা ইমারতের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এর একটা-দুটো ইটও যদি নষ্ট হয়ে যায় তার প্রভাব গোটা ইমারতের উপর পড়তে বাধ্য। এই সমস্যাটা আজ সবাই অনুধাবন করছেন। তবুও কিন্তু প্রকৃতিধ্বংস, প্রাণীহত্যা এবং নির্বিচারে বিজ্ঞান গবেষণার নামে biogenetic (জীববংশজনি) পরিবর্তন ঘটানোর কাজও চলছে। Gerald Durrell-দের মতো প্রাণীবিজ্ঞানীরাও প্রকৃতি ধ্বংসের বিরুদ্ধে, সারা পৃথিবীব্যাপী প্রচার করছেন এই নিয়ে, গড়েছেন এই উদ্দেশে Jersey Wildlife Preservation Trust; তাঁর আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে My Family and Other Animals বইতে: সারা পৃথিবীতে বন্যপ্রাণীকুল বিপদগ্রস্ত। আমাদের তথাকথিত সভ্যতার অগ্রগতির দাপটে তারা আজ বিলুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে।

এই প্রেক্ষাপটে কুট্টিমামার গল্পগুলি কিশোর-কিশোরীদের জন্য আজ অপরিহার্য। সহজভাষায়, স্বচ্ছন্দ গতিতে লেখা বলে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলোও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আদরণীয় হয়ে উঠবে বলে আশা রাখছি।

কলকাতা
জানুয়ারি ২০০০

দেবজ্যোতি দত্ত

ভূমিকা

১৯৯৬-এর নভেম্বর থেকে মার্চ, ১৯৯৭-এর মধ্যে দৈনিক 'গণশক্তি' পত্রিকার বিজ্ঞানের পাতায় আমার কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয় ছিল মূলত প্রাকৃতিক ভারসাম্য, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ। নিবন্ধগুলি বেশ কিছু মানুষের ভালো লাগলেও, আমার মনে হয়েছিল যে, সবার কাছে, বিশেষত কিশোর-কিশোরীদের কাছে ঠিক যেন পৌঁছোতে পারছি না। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের আক্রমণে পড়ার অভ্যাসই যখন ক্রমক্ষীয়মান, তখন নিবন্ধ আরও কম মানুষের কাছে পৌঁছোচ্ছে বলে আমার মনে হয়েছিল। এমন এক সময়ে ভ্রাতৃপ্রতিম গল্পকার নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞানের নানা বিষয়কে গল্পাকারে পরিবেশনের পরামর্শ দিলেন।

পরামর্শটা মনে ধরায়, পর পর কয়েকটি গল্প লেখার চেষ্টা করি, যাদের বিষয়বস্তু বিজ্ঞান। বা বলতে গেলে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যগুলি গল্পের মোড়কে পাঠকের কাছে হাজির করা। অর্থাৎ 'গল্প হলেও সত্যি' গোছের ব্যাপার আর কি! এরকমই একটা গল্প 'জিন বদলের জ্বালা' প্রকাশিত হল 'কিশোর ভারতী' পত্রিকার সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ সংখ্যায়। আবির্ভাব হল কুট্টিমামার; সঙ্গে তার ভাগ্নেদ্বয়—বোঁচন আর বিল্টু এবং ভাগনি মিনু। বাবা, কাকা, মা, মামি, মামা, দিদারা তো আছেনই।

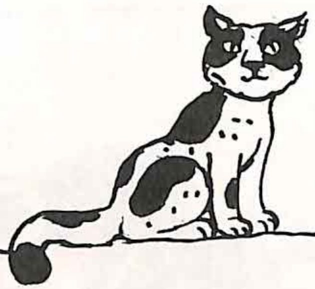
বহু পাঠকের কাছেই গল্পগুলি ভালো লাগছে জেনে, উৎসাহিত হয়ে 'গণশক্তি'র নিবন্ধগুলিও নতুনভাবে পরিবেশনের কথা ভাবতে পারলাম। গল্পের প্রয়োজনে পূর্বতন নিবন্ধগুলির বেশ কিছু তথ্য বর্জন করতে হয়েছে। সে কারণেই বহু নতুন তথ্যও সংযোজন করেছি। তাই এগুলোকে পুনর্লিখন না বলে, সেই নিবন্ধগুলির ভিত্তিতে গঠিত, সম্পূর্ণ নতুন লেখা বলাই ভালো।

আশা রাখি গল্পগুলো পাঠক পাঠিকাদের ভালোও লাগবে, কাজেও লাগবে।

শিশু সাহিত্য সংসদের সুযোগ্য পরিচালক শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত বইটি প্রকাশের ব্যাপারে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সবসময় নজরে রেখেছিলেন। তাঁর কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। শিল্পী অলয় ঘোষাল এত সহজে গল্পগুলির গভীরে প্রবেশ করে, তার মূল সুরকে অক্ষুণ্ণ রেখে, মজাটাও রেখায় রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই সংসদের সকল কর্মীবন্ধুদের, যাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা না থাকলে সর্বাঙ্গসুন্দর করে বইটি প্রকাশ করা যেত না।

কলকাতা
জানুয়ারি, ২০০০

প্রদীপ্ত সেন



সূচি





জিন বদলের জ্বালা

পাগল না হলে কেউ বেড়ালের নাম 'চমৎকারিণী' রাখে?

আমাদের কুট্টিমামার কথা বলছি। তার সব অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার! তার যেমন পোষা বেড়াল আছে, তেমনি পোষা ইঁদুরও আছে। না, না, সাদা ইঁদুর নয়। স্রেফ নেংটি ইঁদুর, তার আবার নামটা বিরাট—"অঘটন-ঘটন-পটিয়সী"। সংক্ষেপে তাকে অঘটন বলে ডাকা হয়। একই সঙ্গে বেড়াল ও ইঁদুর পোষার ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না। কারণ তাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। কিন্তু কী আশ্চর্য! চমৎকারিণী অঘটনের সঙ্গে খেলা করে। অনেকটা সেই কার্টুন ছবির টম আর জেরির মতো তাদের সম্পর্ক।

কুট্টিমামা খেতে বসলে চমৎকারিণী আর অঘটন তার থালার দু-দিকে এসে বসে, এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। এ একেবারে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ানোর মতো ব্যাপার!



শুধু তাই নয়, কুট্টিমামার পোষা তিনটে কাকও আছে। দুপুরের খাবার সময় তাদের দেখা পাওয়া যায়। তাদেরও নাম অদ্ভুত। 'ক' 'চ' আর 'ট'। তিন বর্গের তিনটে প্রথম বর্ণ। এর মধ্যে 'চ' আবার কানা।

এসব পাগলামি সত্ত্বেও কুট্টিমামা আমাদের কাছে অপরিহার্য।

কারণ পৃথিবীর হেন বিষয় নেই, যা কুট্টিমামার জানা নেই। কোনো কথার অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না, জিজ্ঞেস করো কুট্টিমামাকে। কোনো বিষয়ে কিছু বলতে বা লিখতে হবে, কুট্টিমামাই ভরসা। অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, বন্যপ্রাণী, পরিবেশ, জলের নীচের প্রাণী, ডাঙার জীব, গাছপালা, দর্শন, বিজ্ঞান—সব ব্যাপারেই আমাদের এক ও অদ্বিতীয় ভরসা। আমরা বলি জীবন্ত এন্‌সাইক্লোপিডিয়া। এমন ধারা লোক আজকালকার দিনে দুর্লভ। এখন তো সব বিশেষজ্ঞ হবার যুগ। কুট্টিমামা তার মধ্যে এক্সেপ্‌শন। শুধু তাই নয়, মামার আবার এক ছোটোখাটো ল্যাবরেটরিও আছে। তাতে কতরকমের যে এক্সপেরিমেন্ট কুট্টিমামা করেন, তার ইয়ত্তা নেই।

সেদিন বিকেলে কলেজ থেকে মামাবাড়ি গেছি। দিদা পিঠে করে খবর পাঠিয়েছিলেন। কুট্টিমামা এক ফাঁকে কানে কানে বলে গেল, "কাল একটু সন্ধে করে আমার ল্যাবরেটরিতে আসিস। বিল্টু আর মিনুকে সঙ্গে নিয়ে। একটা দারুণ জিনিস দেখাব।"

বাড়ি ফিরে ওদের বলতেই মিনু বলে বসল, "না বাবা, আমি যাব না। সেই সেবারের মতো আবার ভূতের নাচ দেখাবে।"

বিল্টুটাও ভীতু। বলে উঠল, "ঠিক বলেছিস; নইলে সন্ধেবেলা যেতে বলবে কেন? আমিও ওর মধ্যে নেই।"

"ঠিক আছে। আমি একাই যাব। আজ দিদা পিঠে করেছে। তার বেশির ভাগটাই রয়ে গেছে। আজ শুধু গোটা আটেক টেস্ট করেছি। কাল বাকিটা। তোরা না গেলে ভালোই। আর ভূতের নাচ তো কুট্টিমামা দেখিয়েছিল আমাদের ভয় ভাঙাতে। ওটা যে ম্যাজিক তাও বুঝিয়ে দিয়েছিল। যাবি না তো যাবি না।"

"হ্যাঁ-অ্যাঁ ভয় ভাঙাতে না হাতি। অমন করে ভয় দেখিয়ে ভয় ভাঙানো যায়? তবে পিঠের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা।"

"কেন গো বাপু, যা দেখাতে চাও বিকেল বিকেল আলো থাকতে থাকতে দেখাও না।"

"তা—হচ্ছে না। তোমরা কুট্টিমামার রিকোয়েস্ট রাখবে না, অথচ

দিদার পিঠেতে ভাগ বসাবে। তা হবে কেন? পিঠে খেতেও বাড়ি গেলে ল্যাবরেটরিতেও যেতে হবে।"

বিল্টু আর মিনু কথা না বাড়িয়ে স্কুল চলে গেল। ফিরেও এল ঠিক সময়ে। আমি কলেজ থেকে ফিরে দেখি, দুজনে যাবার জন্য রেডি। এমনকী মায়ের কাছ থেকে পারমিশন করানোও হয়ে গেছে। মায় আমার পারমিশনও। অবশ্য কুট্টিমামার কথা ওরা বলেনি। শুধু দিদার নেমন্তন্নের কথাই বলেছে। কুট্টিমামার নেমন্তন্ন শুনলে মা অন্তত ওদের যেতে দিতেন না। ভূতের নৃত্য দেখে, চোখ-টোখ উলটে গতবার মিনু যা কাণ্ড বাঁধিয়েছিল!

যাক্‌গে। ঠিক সময়মতোই পৌঁছোলাম।

পেট আইঢাই করার পক্ষে যথেষ্ট পিঠে ছিল। তারপর দিদার সঙ্গে গল্প। দিদা যেদিকে পিঠ দিয়ে গল্প বলছিলেন, সেদিকের দরজাটা একটুকু ফাঁক করে কুট্টিমামা মুখটা বের করে দেখালেন। বুঝলাম, সময় হয়েছে।

"দিদা এবার উঠি।"

চললাম কুট্টিমামার ঘরে। ভাগ্যিস দিদা চোখে কম দেখে। নইলে নির্ঘাত জিজ্ঞাসা করতেন, "ওদিকে আবার কোথায় যাচ্ছিস?"

শুধু তাই নয়। ভূতের নাচের পর থেকে ওঘরে আমাদের যাওয়াও বারণ। বড়োমামা আর দিদার কাছে সেবার কুট্টিমামাকে খুব বকুনি খেতে হয়েছিল।

আমরা তিনমূর্তি ঢুকতেই কুট্টিমামা সাবধানে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। তারপর তক্তপোশটার ওপর বাবু হয়ে বসে বলল, "বল দেখি, জিন সম্বন্ধে কী জানিস?"

আমরা মেঝেতে বসতে যাচ্ছিলাম। মিনুটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, "কুট্টিমামা, আবার তুমি ভয় দেখাচ্ছ? আমি কিন্তু দিদাকে বলে দেব।"



কুট্টিমামা অবাক, "এ কী রে, ভয় দেখালাম কোথায়?"

"দেখাওনি এখনও। তবে দেখাতে যাচ্ছ।"

"তার মানে?"

"বাঃ। জিন মানে ভূত তা বুঝি আমি জানি না? আলাদিনের গল্পে আছে।" —মিনু তার ক্লাস সিক্সের বিদ্যে ঝাড়ে।

বিল্টুটা একটু বেশি পাকা। ক্লাস এইটে পড়ে। যা পায়, তাই পড়ে। গম্ভীরভাবে বলে ওঠে, "মিনু অবশ্য ঠিকই বলেছে। জিন, আফ্রিদ, হুমদো, মামদো এসব হল আরবি ভূত। আমি পরশুরামে পড়েছি।"

এবার কুট্টিমামা হেসে ফেলে। "না রে না। আমি সে জিনের কথা বলছি না। আমি বলছি, ইংরেজি জিনের কথা। জি, ই, এন, ই।"

বিষয়টা আমার অনেকটা জানা। হেসে বললাম, "ও, তাই বলো। কিন্তু তুমিও যেমন! ওরা ব্যাপারটা বুঝবে কেমন করে।"

"ঠিক আছে। তুই বল দেখি।"

আমি গড়গড় করে উগরে দিলাম, "প্রতিটি প্রাণীর দেহ বিভিন্ন কোষ বা যাকে ইংরেজিতে বলে সেল, তাই দিয়ে তৈরি। আর এই কোষগুলোর কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে থাকে ক্রোমোজোম। জোড়ায় জোড়ায়। বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন সংখ্যক জোড়া। যেমন মানুষের কোষে আছে ছেচল্লিশটি ক্রোমোজোম। এই ক্রোমোজোমের মূল রাসায়নিক উপাদান ডি-এন-এ বা ডি-অক্সি-রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড। ক্রোমোজোমের কথা বৈজ্ঞানিকরা অনেকদিন থেকেই জানতেন। জানতেন বংশগতির ধারা বা হেরিডিটির জন্য ক্রোমোজোমই দায়ী। তারা অনেক আগেই আন্দাজ করেছিলেন ক্রোমোজোম বেশ কিছু জিনের সমষ্টি। আসলে এই জিনগুলোই ডি-এন-এ। আর এরা দেখতে স্ক্রুর মতো প্যাঁচালো, জোড়া জোড়া। ইংরেজিতে বলে ডাব্‌ল হেলিক্স (double helix)। এটা আবিষ্কার করেছেন জেম্‌স ওয়াটসন আর ফ্রান্সিস ক্রিক্। ১৯৫৩ সালে। এই আবিষ্কারের জন্য এঁরা দুজনে ১৯৬২ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।"



"বলেছিস ঠিকই। তবে, এর সঙ্গে আরও যোগ করার আছে। সবটা তোরা বুঝবিও না। তবে একটা কথা জেনে রাখ—আমাদের শুধু নয়, সব প্রাণীরই দৈহিক গঠন, চরিত্র ইত্যাদির অনেকটাই নির্ভর করে এই জিনের ওপর। এই যে মিনুর নাকটা একটু বোঁচা,—"

"একদম বাজে কথা বোলো না কুট্টিমামা। তোমার চেয়ে আমার নাক লম্বা।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। লম্বা অথচ চাপা। সেটা ঠিক করে দিয়েছে ওর শরীরের কোষের বিশেষ একটা জিন। আমার এই যে গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ . . ."

"তুমি শ্যামবর্ণ? তাহলে তো আমি মেমসায়েব। তুমি দস্তুরমতো কালো।"

"যাগ্‌গে মেনে নিলাম। কিন্তু সেই গায়ের রংটাও ঠিক করেছে আমার শরীরেরই জিন। এই যে, বোঁচন (আমার ডাক নাম), খেতে বড়ো ভালোবাসে . . . ।"

এবার আমার রাগ হয়ে গেল, "কেন? তুমি কিছু কম বাসো? কাল দিদা দু-টিফিন বক্স পিঠে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিল আমাদের জন্য। তার পুরো একটা টিফিন বক্স কে সাবড়েছে, অ্যাঁ? ফ্রিজ খুলে দিদা আজ অবাক!"

"না, বোঁচনবাবু। প্রামাণ নেই।"

"না থাকুক। সন্দেহ তোমার দিকেই।"

"শুধু সন্দেহের বশে কাউকে অভিযুক্ত করা চলে না। আমার মায়ের চোখের ব্যামো। খুবই কম দেখে। ফ্রিজে রাখার পর তুমি নিজেই যে এক বাকসো পলিথিন প্যাকেটে ঢেলে নিয়ে যাওনি, তার প্রমাণ আছে? তোমার দিদা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার বেশ কিছু পরে তুমি ওঘর থেকে বের হয়েছিলে। কী করছিলে ততক্ষণ?"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "মানে, আমি বাথরুমে ছিলাম।"

"তবে? কাল তুমি একঘণ্টা এ বাড়িতে ছিলে। তার মধ্যে তিনবার বাথরুমে গিয়েছিলে কেন? এতেই প্রমাণ হয় তুমি পেটুক। এবং এটা তোমার জন্ম থেকেই ঠিক আছে, যে তুমি পেটুক হবে। কারণ একটা বিশেষ জিন ওটা ঠিক করে দিয়েছে।"



কী কাণ্ড! আমি ক'বার বাথরুমে গিয়েছি তা পর্যন্ত নজরে রেখেছে। কিন্তু ওঘরে তো নিজে ছিল না! তবে কি কুট্টিমামা সব ঘরে ক্লোজ সার্কিট টিভি ক্যামেরা বসিয়েছে?

"আচ্ছা মেনে নিলাম, বোঁচনদা জন্ম থেকেই পেটুক। তা, এ গুণটা তো নিশ্চয়ই ও জন্মসূত্রেই পেয়েছে।" বিল্টু কোনদিকে এগোচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না।

"নিশ্চয়ই। মানুষ বা সব প্রাণীরাই এটা তাদের মা বা বাবার কাছ থেকে পায়। আমরা আমাদের ভেতরের জিনগুলো সেভাবেই পেয়েছি।"

"তাহলে, যদি বলি সেই দোষ বা গুণ তার মা বা বাবার মধ্যে ছিল, নিশ্চয়ই ভুল বলা হবে না?"

"কখনোই না।"

"এবার যদি বলি, বড়দা তার এই দোষ বা গুণটা তার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে, অর্থাৎ তোমাদের বংশ থেকেই পেয়েছে তাহলেও ভুল বলা হচ্ছে না।"

এবার কুট্টিমামা অপ্রস্তুত। "—তার কোনো মানে নেই। মানে, ওটা বাবার দিক থেকেও আসতে পারে।"

"বাবার দিক থেকে যে আসেনি তা পরিষ্কার। আমাদের বংশের সবাই স্বল্পাহারী। বরং তোমাদের বংশের ও সুনাম আছে। আর তোমার তো কথাই নেই। দিদা নিজেই তার সাক্ষী দেবেন।"

বিল্টুটা বড়ো হলে নির্ঘাত উকিল হবে। নয়তো হাকিম। আর কুট্টিমামার ভাগ্যটাও বেশ খারাপ। কারণ, ওই সময়েই মিনু চেঁচিয়ে উঠল, "ওই দেখো, ওই দেখো!"

কুট্টিমামার চমৎকারিণীর মুখে একটা গোটা পাটিসাপটা পিঠে। পরিষ্কার দিদার ছাপমারা। বইয়ের র‍্যাকের পিছন থেকে উঁকি মারছে শ্রীমান বেড়াল। বিল্টু ছুটে গিয়ে র‍্যাকের পেছন থেকে পলিথিন প্যাকেটে মোড়া পিঠের বান্ডিল বের করে ফেলল। তখনও গোটা তিনেক আছে।

"কী কুট্টিমামা, এবার?"—তিনজনে সমস্বরে বলি।

ধরা পড়া কুট্টিমামার মুখটা যদি তখন দেখতে! কুট্টিমামাও শাহেনশা লোক। ঠিক সামলে নিল। তারপরেই পড়ল চমৎকারিণীকে নিয়ে,—"হতভাগা শয়তান। কোত্থেকে সব চুরি করে এনেছ?"

"থাক, থাক মামা। বিভীষণকে বকুনি দিলেই কি রাবণ নির্দোষ প্রমাণ হয়?"

"দেখ, তোরা অমন করলে সেই জিনিসটা দেখাব না।"

"ঠিক আছে। কী দেখাবে দেখাও।"

"দেখাবই তো, তার আগে ব্যাপারটা বুঝে নে। অর্থাৎ পণ্ডিতেরা বলতে চাইছেন, আমাদের শরীরের আকৃতি-প্রকৃতি সবই নির্ভর করে জিনের ওপর। আমি কালো হব, না ফর্সা, মোটা না রোগা, বেঁটে না লম্বা—সব ঠিক করে দেয় ওই জিনেরা। এমনকী চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যও অনেকটা জিনের দান। আবার ভবিষ্যতে আমার শরীরে কী কী রোগ হতে পারে, তাও নাকি এই জিনেরা ঠিক করে রাখে। নানা মানুষের শরীরে নানা রোগের প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকে। তাও এই জিনের জন্যে। এ শুধু মানুষ নয়, প্রতিটি জীব, প্রতিটি গাছপালা, সবাই জিন দিয়ে নির্দিষ্ট। এ নিয়ে আজকাল কিছু বাড়াবাড়ি হচ্ছে ঠিকই, তবে এর অনেকটা সত্যি।"

"কেন? অনেকটা কেন? সবটা নয় কেন?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"সে অন্য প্রশ্ন, তা নিয়ে আলাদাভাবে বলতে হবে। তবে এটা জেনে রাখ, এর বাইরেও নানা ব্যাপার আছে। পরিবেশ, পরিস্থিতি একটা বড়ো ফ্যাক্টর। বিখ্যাত পণ্ডিতের সন্তানকে আফ্রিকার গহন জঙ্গলে আদিবাসীদের মধ্যে মানুষ করলে সে তো আর বাপের মতো পণ্ডিত হবে না! বিশেষ করে মানুষের বেলা তার পারিপার্শ্বিক সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি গভীর প্রভাব ফেলে। যাই হোক, সেসব অন্য কথা।

"যেকথা বলছিলাম, বুদ্ধিমান বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করলেন, এতই যখন জানা গেল, তখন জিন পালটে দেবার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? যেমন ধর, দেখা গেল, কারো জিনে পরবর্তীকালে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা আছে। যদি সেটাকে পালটে ক্যান্সার-প্রতিরোধী জিন দেওয়া যায়, তবে ভবিষ্যৎ জীবনে তার ক্যান্সার হবার ভয় থাকবে না। বা একেবারে কমে যাবে। অনেক শিশুরই জন্ম হয় হৃদপিণ্ডের নানা অসুখ নিয়ে। এসব জন্মগত রোগকে ডাক্তাররা বলেন কন্‌জেনিটাল। বিজ্ঞানীরা যদি সেই



অসুখের কারণের জিনটাকে অর্থাৎ অসুস্থ জিনটাকে পালটে একটা সুস্থ জিন ভরে দিতে পারে, তবে বাচ্চারা আর এসব রোগ নিয়ে জন্মাবেই না।"

"সে কীভাবে সম্ভব? একটা মানুষের শরীরে কোটি কোটি কোষ। প্রত্যেকটা কোষের জিন এভাবে পালটানো কি সম্ভব?"

"না সম্ভব নয়। আর তা করার কথা কেউ ভাবছেও না।"

"তবে?"

"উপায় একটাই। জন্মের আগেই জিনটা পালটে ফেলা। মাতৃগর্ভেই, বা বলতে গেলে জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই জিনটাকে পালটে দিতে হবে।"

"কিন্তু তখন জানবে কী করে শরীরে কী দোষ হতে পারে?"

"ঠিক বলেছিস। বিজ্ঞানীরা সেজন্যে জিন ম্যাপিং-এর ব্যবস্থা করছেন। এমন একটা দিন আসছে, যখন মাতৃগর্ভে প্রথম কোষ তৈরি হবার সময়েই যন্ত্র দিয়ে জানা যাবে, সেই কোষের জিনগুলোর কী কী দোষ বা গুণ আছে। এবং এটা করতে হবে কোষের টোটিপোটেন্সি নষ্ট হবার আগে।"

"টোটিপোটেন্সি!"

"এই তো কত্তা! বায়োলজি নিয়ে কলেজে পড়ছ, এখনও নামই শোননি। এখন সবটা তোরা বুঝবিও না। তবু যতটা পারি সহজ করে বলি:

"প্রাণীর যখন জন্ম হয়, অর্থাৎ তার প্রাণের শুরু হয়, তখন সে থাকে এককোষী প্রাণী। একটি মাত্র কোষ। এর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে গোটা প্রাণী। এরপর কোষটি বিভক্ত হতে থাকে। তাকে বলে মাইটোসিস প্রক্রিয়া। একটা কোষ ভেঙে হয় দুটো। দুটো ভেঙে চারটে। আবার চারটে ভেঙে আটটা। এই কোষগুলোকে বলে ব্লাস্টোমিয়ার। এই ব্লাস্টোমিয়ার একসময় একটা রূপের কাছাকাছি আসে। তখন বলা হয় ব্লাস্টুলা। এই পর্যন্ত কোষগুলির একটা বিশেষ গুণ থাকে। সেটা হল, যে কোনো কোষের শরীরের যে কোনো অংশে পরিণত হবার ক্ষমতা—তাকেই বলে টোটিপোটেন্সি। এরপর কোষগুলো আরও ভাগ হতে থাকে। আর এক এক কোষ শরীরের এক এক অংশে পালটাতে থাকে। কারো থেকে হয়

হৃদপিণ্ড, কেউ হয় চামড়া, কেউ রক্ত, কেউ মস্তিষ্ক, হাত, পা ইত্যাদি। অর্থাৎ এরা তখন তাদের টোটিপোটেন্সি হারিয়ে ফেলেছে। এদের মধ্যেও অবশ্য সব ক্রোমোজোম, সব জিন থাকে। কিন্তু নির্দিষ্টটি ছাড়া বাকিরা থাকে সুপ্ত। এই টোটিপোটেন্সি নষ্ট বা সুপ্ত হবার আগেই জিন বদলাতে হবে। তাহলে বাকি কাজ প্রকৃতি আপনা থেকেই করে দেবে।"

"আচ্ছা কুট্টিমামা এই জিন কথাটা এল কোথেকে?" বিল্টু হঠাৎ বলে ওঠে।

"গুড। ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। ১৯০৯ সালে ডেনমার্কের জীববিজ্ঞানী উইলহেলম লুডভিগ জোহানসেন (Wilhelm Ludvig Johannsen) প্রথম জিন কথাটি ব্যবহার করেন। কেন এর নাম জিন তা অবশ্য জানা নেই। তবে মনে হয় জেনারেশন (generation) শব্দের প্রথম চারটি বর্ণ নিয়ে তৈরি হয়ে থাকতে পারে।

"আর এই জিন থেকেই এসেছে বিজ্ঞানের নতুন শাখা, জেনেটিক্স। জেনেটিক্স-এ জিন নিয়ে চর্চা করা হয়। কিন্তু এই যে জিন পালটানো, খোদার ওপর খোদ্‌কারি করা, তার জন্য আছে আরও স্পেশালাইজেশন। তার নাম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। অবশ্য বায়োটেকনোলজিতেও এসব খোদ্‌কারি চলে।"

মিনু বোধ হয় কিছু অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। বয়েসে নেহাত ছেলেমানুষ, এসব কচকচি ভালো লাগবে কেন? সে বলে ওঠে, "তুমি তো তখন থেকে বকেই চলেছ! কী দেখাবে, দেখালে না তো!"

"আরে, দাঁড়া, দাঁড়া—অত ব্যস্ত হলে ফসকাবে শিকার! —মিনু রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখে বলে কুট্টিমামা 'বাল্মীকিপ্রতিভা' থেকে কোট করলেন নাটকীয় ভঙ্গিতেঃ "সবটা একটুও না বুঝে নিলে হয়? এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়েই আমাদের আজকের ব্যাপার।

"তোদের বলেছি, খারাপ বা অপছন্দের জিন পালটানোর কথা বিজ্ঞানীরা বেশ কিছুদিন ধরেই চিন্তা করছেন। প্রাণীদেহের ওপর বেশি কাজ এখনও হয়নি। সবচেয়ে বেশি কাজ হয়েছে ব্যাকটিরিয়া নিয়ে। বিজ্ঞানীরা অনেকটাই কাজ করেছেন গাছপালা নিয়ে।"



"তুমি কি এখন আমাদের তেমন একটা গাছ দেখাবে নাকি?" বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বলে মিনু এসব শুনতে চাইছে না।

"আচ্ছা মিনু, তুই তো আম খুব ভালোবাসিস। তোর এখন আম খেতে ইচ্ছে করছে না?"

'ইচ্ছে হলেই কি পাওয়া যায় নাকি? আম তো গরমের ফল। শীতকালে পাব কোত্থেকে?"

"তোকে এখন যদি একটা আপেল দিই, খাবি?"

"ধ্যুস! দেখতে পারি না। মামণি রোজ জোর করে আপেল দেয় টিফিনে।"

"না, মনে কর দেখতে আপেল; খেতে গিয়ে দেখলি একদম ল্যাংড়া আমের গন্ধে ভরপুর, তখন কেমন লাগবে?"

"দারুণ। তখন আর বন্ধুদের বিলি করে দেওয়া যাবে না।"

"ওঃ, তার মানে তুমি রোজ স্কুলে আপেল বিলি করে দিচ্ছ। দাঁড়াও মামণিকে বলে দিচ্ছি।"

এই রে! ব্যাপারটা যে অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "তোরা চুপ করবি? নইলে দুটোকেই বের করে দেব। কুট্টিমামা বলো তো—আমের মতো আপেল কী করে হবে?"

"—আমের মতো নয়। বলেছি আমের গন্ধওয়ালা। আসলে আপেলের একটা বিশেষ জিন তার গন্ধের জন্যে দায়ী। এখন যদি আপেলের সেই জিনকে পালটে তার জায়গায় আমের থেকে সেই জিনটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেই কেল্লা ফতে। আমি, আম আর আপেলটা একটা উদাহরণ হিসেবে দিলাম। এধরনের ঘটনা ঘটানো যেতেই পারে। অনেক বিষাক্ত ফলকে খাদ্য করা যেতে পারে। তেতো করলাকে মিষ্টি করা যেতে পারে। এমনকী মটরদানাকে টেনিস বলের মতোও করা যেতে পারে. . . এইরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়।"



"তা, ভালোই তো।" আমি যোগ করি, "তখন সন্দেশ ফেলে করলা খাব। আর ছুরি দিয়ে কেটে কেটে ঘুগনি খাব।"

"হ্যাঁ, তাহলে তো ভালোই হত। মানুষ সেরকমই ভাবতে শুরু করেও

ছিল। মুশকিলটা হল অন্য জায়গায়। লোভ-লালসা বলে মানুষের যে একটা মনোবৃত্তি আছে, তার জন্যে কোনো বিশেষ জিন দায়ী কি না জানি না; বিজ্ঞানীরা যদি বুদ্ধি করে পৃথিবীর সব মানুষের মন থেকে এ দুটোকে মুছে দিতে পারতেন, তবে সব মুশকিলের আসান হয়ে যেত।"

"কেন? লোভ একটু আধটু না থাকলে তোমার খাবার ইচ্ছেটাই চলে যাবে যে!"

"দূর, বোকা। এদের লোভ একটু-আধুট নয়, অনেকটা। মনে কর, যদি এসব গবেষণায় আর আবিষ্কারে মানুষের ভালো করা যেত তবে কী না ভালোই হত। কিন্তু আমরা কী দেখছি? দেখছি এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার আর বায়োটেকনোলজিস্টরা এমন সব জিনিস সৃষ্টি করছেন, তাতে মানুষের ভালো হবার চেয়ে খারাপই হচ্ছে। ভেবে দেখ, আমেরিকার বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন এমন ভুট্টার বীজ, যা যেকোনো উইডিসাইড, মানে ঝোপঝাড় নষ্ট করে যে কেমিক্যাল, তা সহ্য করতে পারবে। অর্থাৎ খেতে যে ঝোপঝাড় আগাছা হয় তাকে ধ্বংস করতে যে ওষুধ ছড়ানো হয়, তা ভুট্টা গাছের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এতদিন পর্যন্ত চাষিরা শস্যখেতে এসব রাসায়নিক ওষুধ খুব সাবধানে প্রয়োগ করত। কারণ আগাছা মারার সঙ্গে সঙ্গে চারাগাছ মরে যাবার সম্ভাবনা থাকত। এখন আর সে ভয় নেই।"

"তুমি তাহলে নিন্দে করছ কেন? এ তো ভালোই হয়েছে।"

"ওই তো, তুইও একই কথা বললি। এ হল আপাত চোখে ভালো। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে কী মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। এ ধরনের বীজ কারা তৈরি করেছে, জানিস? আমেরিকার মনসানটো নামে এক বহুজাতিক সংস্থা।

"প্রথমত এই নতুন বীজ তাদের কাছ থেকেই কিনতে হবে, এবং চড়া দামে। আবার অন্যদিকে, ওই মনসানটোরই তৈরি আগাছা ধ্বংসের রাসায়নিকের বিক্রিও হু হু করে বেড়ে যাবে।"



"বাব্বা এ তো সাংঘাতিক ফল। দু-দিক দিয়ে নাফা।"

"শুধু কি তাই? মনসানটো এমন বীজ বানিয়েছে যে বীজ থেকে



আর নতুন বীজ হবে না। কিন্তু শস্য হবে। অর্থাৎ চাষির ঘরে বীজ থাকবে না। ইয়োরোপের চাষিরা এ বীজের নাম দিয়েছে টার্মিনেটর (Terminator) অর্থাৎ ধ্বংসকারী। এতকাল চাষিরা নিজেদের চাষ থেকেই খানিকটা শস্য পরবর্তী ফসলের বীজের জন্য রাখত। কিন্তু এই নতুন ধরনের বীজ থেকে উৎপন্ন শস্যের সে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে প্রত্যেকবার চাষের সময় চাষিকে মনসানটোর দ্বারস্থ হতে হবে। এও কিন্তু জিন বদলের খেলা। নতুন বীজ উৎপাদন করার জন্য যে জিনটির দরকার, সেটিকে ছেঁটে ফেলে দেওয়া হয়েছে এই টার্মিনেটর বীজে। অথচ সাধারণ বীজের থেকে এই বীজে শস্যের ফলন বেশি। সেদিক দিয়ে চাষিদের কাছে লোভনীয়।"

"এ তো রাক্ষুসে বুদ্ধি কুট্টিমামা।" —মিনুও ব্যাপারটা ধরতে পারে।

"এখানেই শেষ নয়, বুঝলি। গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, মানুষের তথা পৃথিবীর ও পরিবেশের কী ভীষণ সর্বনাশ এরা করছে।"

"কীরকম?"

"প্রথমত, এইসব গাছের পরাগ আশেপাশের গাছে পড়ছে। সে গাছগুলোতেও এসব জিন ছড়িয়ে পড়ছে। তার উপর আগাছানাশক অত্যধিক ব্যবহারের ফলে তা জলে ধুয়ে বা বাতাসে মিশে অন্যসব ভালো গাছেরও বারোটা বাজাচ্ছে। এদের তীব্র বিষক্রিয়া পড়ছে প্রাণীদের উপর। অর্থাৎ যারা এসব খেয়ে বেঁচে থাকে তাদের খতম করছে। ফলে বিশ্বজগতে যে খাদ্যশৃঙ্খল আছে, তা ভেঙে যাচ্ছে।

"একসময় সারা পৃথিবী জুড়ে ডি ডি টি ব্যবহার হতো, কীট ও আগাছা-নাশক হিসাবে। আজকে প্রায় সব দেশে তাকে নিষিদ্ধ করতে হয়েছে। হলে হবে কী, এ বিষ সারা পৃথিবীতে ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকী সেই সুদূর দক্ষিণ মেরুর তিমির শরীরেও ডি ডি টির সন্ধান পাওয়া গেছে।"



"আচ্ছা মামা, শুধু কি ভুট্টার বীজেই জিন বদলানো হয়েছে? না কি অন্য সব শস্যেও?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"না, না, শুধু ভুট্টায় কেন? এরকম সয়াবিন বীজ বানানো হয়েছে।

১৯৯৪ থেকে আজ পর্যন্ত নয় জাতের অমন ধারা বীজ ইয়োরোপে আমদানি করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই দশ কোটি একর জমিতে তাদের চাষ চলছে। এ ধরনের শস্যকে বলা হয় 'জি-এম' অর্থাৎ 'জেনেটিক্যালি মডিফায়েড'। এই শস্য বিক্রি করতে গেলে, বা তা দিয়ে প্রস্তুত কোনো খাবার বিক্রি করতে গেলে তার গায়ে 'জি-এম' ছাপ মারতে হয়। বিশেষত ইয়োরোপে আমেরিকায়।

"যারা একটু চিন্তা-ভাবনা করেন, মানুষের ভালো চান এমন মানুষও তো আছেন। তারা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এই 'জি-এম' খাবারের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে, বিশেষত ইয়োরোপে তুমুল বিক্ষোভ চলেছে। আবার নিজেদের তৈরি করা মাল বাজারে চালাতে মনসানটোও বসে নেই। তারা হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় করে চলেছে বিজ্ঞাপন বাবদ। বহু বড়ো বড়ো ও বিখ্যাত পত্রিকার মালিকদের প্রায় কিনেই নিয়েছে, তাদের হয়ে প্রচার চালাবার জন্য।"

"আমাদের দেশেও কি এসব শস্য এসেছে?"

"অবশ্যই। জিন পালটানো তুলোর চাষ দক্ষিণ ভারতে চলছে। তুলোর ক্ষতিকারক 'বোল উইভিল' পোকা থেকে এ বীজ নিজেই নিজের রক্ষক। ফ্লাভর সাভর (Flavr Savr) টমাটো আগেই এসেছে। আসলে মানুষের শরীরে এদের প্রতিক্রিয়া কী কী হতে পারে, তা ভালোভাবে না জেনেই, এদের চাষ বাড়িয়ে চলা হচ্ছে। শুধু মানুষের নিজের শরীর নয়, তার প্রাকৃতিক পরিবেশেও কী কী ক্ষতি হতে পারে, তার সবটা জানা নেই। অথচ তোরাও নিশ্চয় জানিস, পরিবেশের ভারসাম্য সামান্য এদিক-ওদিক হলেই মানুষের জীবনে বিরাট প্রতিক্রিয়া পড়ে। এদিকটা কেউ দেখছে না। ইতিমধ্যেই নাকি আমেরিকাতে গাজর, পেঁয়াজ, আপেল, পেঁপে, গোলমরিচ, তরমুজ আর স্কোয়াশের মতো গাছের, এ ধরনের জিন পালটানো পঞ্চাশটিরও বেশি বীজের, ক্ষেত্র-পরীক্ষা হয়ে গেছে। এগুলোও বাজারে ছাড়া হবে শিগগিরই। এ ধরনের অপ্রাকৃতিক ব্যাপার প্রকৃতি কতটা মেনে নেবে, সেসব না বুঝেই অতি দ্রুত সব গাছপালা পালটে ফেলা হচ্ছে। ইয়োরোপের



সাধারন মানুষ রেগে গিয়ে এসব খাবারের নাম দিয়েছে 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন খাবার'।

কথাটা মনে ছিল। বললাম, "আর টারমিনেটর?"

"হ্যাঁ, সে আরও সাংঘাতিক। চাষিকে বারবার কোম্পানির দ্বারস্থ হতে হবে বীজের জন্য। বিজ্ঞানীরা ভয় পাচ্ছেন, এই টারমিনেটরের প্রভাব পড়বে আশেপাশের সব গাছপালায়। হয়তো খুব শিগগিরই দেখা যাবে অন্য সব গাছপালাও বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ নতুন প্রজন্ম আর পুরোনো গাছ থেকে জন্মাচ্ছে না। তখন কী ভয়ংকর ব্যাপার হবে বল তো? এ বছরের প্রথম দিকে বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকা নেচার-এ একটা পরীক্ষার কথা বেরিয়েছে। কর্নেল (Cornelle) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ও কীটতত্ত্ববিদ জন লসি (John Losy) একটা পরীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছেন, এসব গাছের পরাগ, 'মিল্কউইড' গাছের ফুলের ওপর পড়ায় তা মনার্ক প্রজাপতির মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই প্রজাপতিরা উত্তরে কানাডা থেকে বসন্তের আগে কোটি কোটিতে উড়ে আসে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে। এদের প্রধান খাদ্য মিল্কউইডের মধু। অর্থাৎ এই অদ্ভুত সুন্দর প্রজাপতিও অচিরে নিশ্চিহ্ন হবে দুনিয়া থেকে।"

"তাহলে বলছ, জিন বদলানো ভালো নয়? একাজ তাহলে বন্ধ করা দরকার!" বিল্টু বলে ওঠে।

"তা কেন?" —কুট্টিমামা হাসলেন, "ভালো কাজও তো হতে পারে। জীবজগতের, বিশেষত মানুষের কত উপকার এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারে।"

মিনু ভুলবার পাত্রী নয়। সে এবার কলকল করে উঠল, "অনেক তো বললে, মামা। কিন্তু কী একটা দেখাবে বলেছিলে, দেখালে না তো?"

"দেখাচ্ছি বাবা, দেখাচ্ছি। বোঁচন ঘরের লাইটটা নিভিয়ে দে তো। ওই যে দরজার কাছে স্যুইচ।"

আমি আলোটা নিভিয়ে দিলাম। কুট্টিমামা ম্যাজিশিয়ানের মতো টেবিলটার কাছে গিয়ে, কী একটা যেন ঢাকা ছিল, তার ওপর হাত রেখে বলল, "রেডি, ওয়ান টু, থ্রি।"



ওমা! কী সুন্দর চারটে ইঁদুরের বাচ্চা খাঁচার মধ্যে। আর তাদের গা থেকে সবুজ আলো বেরুচ্ছে। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ির মতো।

তিনজনেই উল্লাসে চিৎকার করে উঠলাম, "থ্রি চিয়ার্স ফর কুট্টিমামা—হিপ হিপ হুররে!"

অন্ধকারেই কুট্টিমামার গলা শোনা গেল, "এ ইঁদুরগুলোর মধ্যেও বাইরের জিন ঢোকানো হয়েছে। হাওয়াই দ্বীপের ধারে এক ধরনের জেলিফিস পাওয়া যায়। তারা এমন ফ্লুওরোসেন্ট; অর্থাৎ অন্ধকারে তাদের গা থেকে জ্যোতি বের হয়। যে জিনের জন্য এটা হয়, সে জিনটা আলাদা করে নিয়ে এ ইঁদুরগুলোর মাতৃগর্ভে জন্মলগ্নেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ভ্রূণ কোষে। ফলে এগুলোও সেই গুণটা পেয়েছে।"

বিল্টুটার খুব বুদ্ধি। সে বলে, "কিন্তু এতে তো বিড়ালের ইঁদুর ধরার আরও সুবিধা হবে। তাহলে যে কটাও বা ইঁদুর ছিল, তারা আর বাঁচবে না।"

"সেটাই তো হয়েছে মুশকিল। চমৎকারিণীকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে অঘটনের সঙ্গে কোনো খারাপ ঘটনা না ঘটাতে। কিন্তু এরা তো আর অঘটন নয়। তাই এদের বাইরে বের করতেও পারছি না। দেখছিস না, চমৎকারিণী জানলার ওপর বসে কেমন জুলজুল করে তাকিয়ে আছে!"

আমরা ব্যাপারটা উপভোগ করতে না করতেই মনে হল বাইরে যেন বেশ একটা হইচই চলছে। তাড়াতাড়ি লাইটটা জ্বালিয়ে বাইরে আসতেই দেখি বড়োমামা, বাবা, কাকা সবাই উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলছে। আমাকে দেখেই কাকা বললেন "ওই তো বোঁচন! তোরা এখানে? বিল্টু আর মিনু কোথায়? আমরা সারা পাড়া তোদের খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তোরা এখানে?"



বিল্টু-মিনুও বের হয়ে এসেছে। মায় কুট্টিমামাও। দিদা কোথা থেকে এসে শুরু করল, "তোমাদের বললাম না, কুট্টির ঘরে দেখো। তা তোমরা থানা, পুলিশ, হাসপাতালের কথা আরম্ভ করলে। দেখলে তো?"

মিনুটা একটু বেশি কথা বলে, "ও বাবা, কুট্টিমামা না আমাদের জিন দেখাচ্ছিল। কী সুন্দর সবুজ ইঁদুর!"

বড়োমামা সঙ্গে সঙ্গে খেপে গেলেন, "কুট্টি, ফের তুই ওদের ভূতের ভয় দেখাচ্ছিলি?"

আমি বললাম, "ভূত কেন হবে? জিন।"

বড়োমামা বললেন, "তুই থাম্। ওই ভূতকেই আরবিতে জিন বলে। তুই দেখছি কুট্টির সাগরেদ হচ্ছিস দিন দিন।"

এতক্ষণে কুট্টিমামা মুখ খোলে, "আহা হা, এ জিন সে জিন নয় দাদা। তুমি খামোকা রাগ করছ, এ ইংরেজি জিন। —জি-ই-এন-ই—জিন।"

"ওই একই হল। ইংরেজিই হোক আর আরবিই হোক, জিন, জিনই।"

কুট্টিমামা আমার আর বিল্টুর দিকে তাকিয়ে হাত উলটোল, "বোঝ একবার। জিন বদলের কত জ্বালা!"

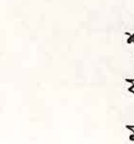




কুট্টিমামাটা যে কখন কী বলে, তার ঠিক নেই!

এই সেদিন পরিষ্কার বলল, "কতদিন যে পায়রার মাংস খাই না!" শুধু আমি নই, বিল্টু, মিনুও সাক্ষী। তারাও ছিল সেখানে। আর আজ যখন পায়রার মাংস খাবার জন্য আমাদের বাড়ি আসতে বললাম, স্রেফ মুখের ওপর বলে দিল, "মাংস খাওয়াই আমি ছেড়ে দিয়েছি। তার ওপর, পায়রার মাংস আমি খাই না।"

আচ্ছা, তোমরাই বলো, সেদিন তুমি অত করে না বললে কি আমি মার কাছে অমন পায়রার মাংস খাবার বায়না ধরতাম? তুমিই তো বললে, "খাসনি তো কখনো কী করে বুঝবি? আর বিশেষ করে ছোড়দি, মানে তোর মা যা রাঁধে না পায়রা—তুলনাহীন! কোথায় লাগে গ্র্যান্ড আর তাজ!"



তোমরা বলো, এসব কথা বললে লোভ লাগে না? আমি এমনিই একটু খেতে ভালোবাসি। অবশ্য পেটুক নই আমি। কিন্তু বার বার তুমি বললে, তাই বায়না ধরলাম। সঙ্গে বিল্টু আর মিনুও অবশ্য ছিল। তাই তো মা ছোটোকাকাকে বলে পায়রা আনিয়ে রেঁধেবেড়ে আমায় বলল,

"যা, তোর কুট্টিমামাকে ডেকে আন। বলে আয়, আজ রাতে এখানেই খাবে।"

আমাদের বাড়ি থেকে মামাবাড়ির দূরত্ব বেশি নয়। বাসে মাত্র দুটো স্টপ, এপাড়া ওপাড়া। তিনজনে মিলে তাই বিকেলবেলা গেলাম ও বাড়ি। আর তুমি মুখের ওপর বললে কিনা, তুমি পায়রার মাংস খাওনা?

মিনুটার খুব চোপা। সে বলে ওঠে, "মিছে কথা বোলো না, কুট্টিমামা। এই সেদিন তুমি আমাদের কাছে পায়রার মাংস নিয়ে কত কথা বললে, বললে, তুমি নাকি কতদিন তা খাও না। বড়মা নাকি দারুণ পায়রা রাঁধে। আর এখন বলছ তুমি খাও না!"

"নারে, মিছে কথা কেন বলব? খেতাম, একসময় খুব খেতাম। কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি। সেই যেবার মার্থা মারা গেল, তখন থেকেই আমি পায়রার মাংস ছেড়ে দিয়েছি। আর এখন তো মাংস, মাছ, ডিম সবই ছেড়ে দিয়েছি। বিশ্বাস না হয়, মাকে জিজ্ঞেস করিস। তোদের দিদা তো তোদের মিথ্যে কথা বলবে না!"

বিল্টু বলে, "কিন্তু মার্থাটা কে? তার সঙ্গে পায়রার মাংসের কী সম্পর্ক?"

"সে এক করুণ কাহিনি। যেমন হৃদয় বিদারক, তেমনি মর্মস্পর্শী!"

কুট্টিমামা যেন ক্ষুধিত পাষাণ থেকে কোট করল মনে হচ্ছে। "হোক মর্মস্পর্শী, শুনিই না সে গল্প।"

"নারে গল্প নয়। এ সত্যি কথা। একেবারে নির্ভেজাল সত্য।"

মিনুটা আদর পেয়ে পেয়ে বাঁদর হয়েছে। বলে ওঠে, "ইস্‌স্‌। তোমার কথা আবার সত্যি! জান, বড়োমামা বলেছে, 'কুট্টির সব গল্প।' জেঠু তাই শুনে বলেছে, 'মোটেই গল্প নয়, গুল্প! গুল মেশানো গল্প।'

"বলেছে বুঝি? তবে থাক। তোদের যখন বিশ্বাসই নেই, কী হবে জেনে মার্থার কথা? কী লাভ সেই পয়লা সেপ্টেম্বরের করুণ কাহিনিটা শুনে?"

"কুট্টিমামা, প্লিজ বলো না। অ্যাই মিনু, তুই যা তো এখান থেকে। তোর এখানে কী দরকার? সবসময় বড়োদের কথার মধ্যে থাকা চাই। না কুট্টিমামা, তুমি সেই মার্থা কী নাম বললে? তার করুণ মর্মস্পর্শী



কাহিনিটা বলো।" বিল্টু তার দাদাগিরি ফলায়। তাতে কাজও হয়। কেন না মিনুটা চুপ করেই গেল।

"কী হল? তুমি চুপ করে কেন কুট্টিমামা? বলো না!" আমিও আবদার ধরি।

"বলব তো! কিন্তু কোনখান থেকে শুরু করব, তাই ভাবছি। আচ্ছা, তোরা কেউ হান্টারের নাম শুনেছিস? জে. জে. হান্টার? তিরিশ-চল্লিশের দশকের বিখ্যাত ব্রিটিশ শিকারি? যিনি আফ্রিকার কেনিয়াতে এই দুই দশক ধরে কত যে সিংহ আর চিতাবাঘ শিকার করেছিলেন, তার সীমা-সংখ্যা নেই। শুধুমাত্র ১৯৪৭ আর '৪৮ সালে, দু-বছরে তিনি একাই আটশো গন্ডার মেরেছিলেন। বর্তমানে গোটা এশিয়াতেও অত গন্ডার নেই। শুনিসনি তার নাম?"

তোমরা জান, বিল্টুটা বয়সের তুলনায় একটু পাকা। সে বলে ওঠে, "কোন হান্টার? সিম্বা বোয়ানার হান্টার?"

"এই তো। জানিস দেখছি তুই।"

আমি বুদ্ধিমানের মতো চুপ করে থাকি। মিনুটা বোকা তো। বলে ওঠে, "তার মানে? সিম্বা বোয়ানা মানে?"

"শব্দগুলি আফ্রিকার ভাষায়। সোয়াহিলি ভাষা। সিম্বা মানে সিংহ, আর বোয়ানা মানে মশাই—মিস্টার। আসলে হান্টার জীবনে এত সিংহ শিকার করেছিলেন, যে ওখানকার অধিবাসীরা তাকে ওই নামে ডাকত। সে যাই হোক, বিল্টু কিন্তু বলেছে একটা বইয়ের কথা। ওই হান্টার সাহেবেরই লেখা বই 'সিম্বা বোয়ানা।' এই হান্টার একসময় নিজে শিকার করা ছেড়ে দিলেন। তখন জীবিকার জন্য শুরু করলেন, অন্যদের শিকারের ব্যবস্থা করার কাজ। ইংরেজিতে বলে সাফারি।"

"জানি, জানি। ওঁর একটা বইও-তো আছে 'আফ্রিকান সাফারি' নামে।"



বড্ড বেশি কথা বলে বিল্টুটা। সবজান্তা! "তুই থাম তো। কুট্টিমামাকে বলতে দে।"

"নারে বিল্টু ভুল বলেনি। তবে সেকথা থাক। যেকথা বলছিলাম ঃ

সাফারি। ইয়োরোপ আমেরিকার উঠতি বড়োলোকদের তখন নেশা চেপেছে দেশে-বিদেশে, বিশেষত আফ্রিকা, এশিয়ার নানা দেশে শিকার করার। ইচ্ছে হাতি, বাঘ, সিংহ, চিতা, গন্ডার কুমির মারার। ওদিকে ভালো করে গুলিই হয়তো চালাতে জানে না। আর সত্যিকারের বাঘ, সিংহ সামনে দেখলে, হয়তো . . .সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার!

"কিন্তু পয়সা আছে অগাধ। সুতরাং পয়সার জোরে শিকার করতে হবে। তা, এদের সংগঠিত করতেন হান্টার আর তার মতো কিছু পাকা শিকারিরা। শিকারি শিকারকে সাজিয়ে গুছিয়ে হাজির করে দিত। আর বিলিতি সাহেবরা উঁচু মাচায় বসে বা গাড়ির ভেতর থেকে বন্দুক, রাইফেল চালাত। অবশ্য বেশিরভাগ সময় বন্দুক-ঠন্দুক তাদের হাত থেকে পড়ে-টড়েও যেত। আর গুলিও শিকারের গায়ে লাগত না। কিন্তু শিকার মরত। আসলে হান্টার বা তার মতো সংগঠনকারীরাও একই সঙ্গে গুলি চালাত। তাতেই মরত শিকার।

"এবার শুরু হত আসল খেলা। সাহেব শিকারি বা মেম শিকারি মৃত সিংহের বা গন্ডারের পিঠে পা রেখে, হাতে রাইফেল নিয়ে খুব কায়দা করে ছবি তুলত। দেশে ফিরে নিজেদের বৈঠকখানায় সে ছবি বাঁধিয়ে রেখে কত গল্প করত বন্ধু-বান্ধবদের! আর শিকারের চামড়াটা বা মাথাটা কেটে নিয়ে নিজেদের ঘরে ট্যাক্সিডার্ম করে সাজিয়ে রাখত প্রমাণ হিসাবে। ট্যাক্সিডার্ম করা জানিস তো?"

এটা আমার জানা। ঝট করে তাই উত্তর দিতে পারলাম। "হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি। মরা জন্তুর পেটের ভেতর থেকে সব বের করে নিয়ে খড় বা তুষ পুরে আবার জ্যান্ত জন্তুর মতো সাজিয়ে রাখা তো? আমাদের বাড়িতেই তো একটা অমনধারা ম্যাকাও আছে। ছোটোকাকা কোথা থেকে এনেছিলেন যেন।" বিল্টুটা কথা বলার চান্সই পেল না।

"যাই হোক। এভাবে শিকার চলছিল। অবস্থা এমন হল যে কেনিয়া থেকে চিতাবাঘ প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। অনেকেই ভাবল, যাক আপদ গেল। মানুষের ঘর থেকে গোরু ছাগল চুরি করার আর কেউ রইল না। মানুষেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কিন্তু তাই কি?



"চল্লিশের দশকের শেষ দিকের কথা। হঠাৎ সে বছর কেনিয়াতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মাঠের পর মাঠ শস্যহীন। চারদিকে হাহাকার। দলে দলে খাদ্যের অভাবে মানুষ মারা যেতে লাগল। এবার মানুষের টনক নড়ল। হান্টারের মতো বুদ্ধিমান মানুষেরা বুঝলেন এর কারণ। তাঁরা বললেন, এভাবে চিতাবাঘ মেরে শেষ করে দেওয়ায় এই সর্বনাশ হয়েছে। চিতাবাঘের বংশলোপই এই দুর্ভিক্ষের কারণ।"

"দুর, তাই কখনো হয় নাকি? খেতে ফসল হয়নি, তার জন্য চিতাবাঘ না থাকা কোনো কারণ হতে পারে নাকি?" আমি না বলে পারলাম না।

"তাই তো হল। সেবারের দুর্ভিক্ষ তো আর অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির জন্য হয়নি! সমস্ত শস্যখেত নষ্ট করেছিল লক্ষ লক্ষ বেবুনের ঝাঁক। তারা দলে দলে সারা কেনিয়া জুড়ে ফসলের মাঠে নেমেছে। যথেচ্ছ ফসল খেয়েছে। নষ্ট করেছে আরও বেশি।

"কিন্তু এই বেবুন হঠাৎ এভাবে সংখ্যায় বাড়ল কেন? চিরকালই বেবুনরা ফসল নষ্ট করে। তখন তাদের সংখ্যা ছিল কম। দু-তিন বছরের মধ্যে তাদের সংখ্যা অসম্ভব রকমের বেড়ে গেল। কারণটা ওই চিতা না থাকা। চিতা এবং লেপার্ড-এর এক প্রিয় খাদ্য বেবুনের মাংস। তারা বেবুনের বংশ বৃদ্ধি করতে দিত না। বা বলতে গেলে, ভারসাম্য বজায় রাখত। এখন এই সাফারির কল্যাণে চিতা আর লেপার্ডের বংশ নাশ। ফলে বেবুনের সংখ্যা অসম্ভব রকমের বৃদ্ধি। তারই ফলে দুর্ভিক্ষ! বহু বহু লোকের অনাহারে মৃত্যু।"

"এসব কি মানুষ বোঝে না? তারা এভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্টই বা করে কেন?"

"খুবই জটিল প্রশ্ন করলি। বোঝে এবং বোঝে না। কিছু লোক তো নিশ্চয়ই বোঝে। বড়ো লোকেরা ভাবে, কেনিয়ায় কিছু গরিবগুরবো মারা পড়বে তো আমার কী? আবার একদল ভাবে, আমি একটা চিতা মারলে কী যায় আসে? আছে তো অনেক। কেউ টেরও পাবে না। কিন্তু তাই কি হয়? বিন্দু বিন্দু করেই তো সিন্ধু তৈরি হয়। চিনচিলাদের কথাই ধর না কেন?"



"চিনচিলা? তারা আবার কারা?" বিল্টুর জিজ্ঞাসা।

"চিনচিলা হল খরগোশের সাইজের ছোট্ট একটা প্রাণী। ভারী মিষ্টি! তাদের চামড়া খুব মোলায়েম, নরম আর সারা গা ভরতি সুন্দর লোম। পেরু, বলিভিয়া আর চিলির পাহাড়ি অঞ্চলে এক সময়ে লক্ষ লক্ষ চিনচিলা ঘুরে বেড়াত। এদের গায়ের চামড়া দিয়ে তৈরি কোট ইয়োরোপের ধনী মহিলাদের খুব প্রিয় ছিল। বড়োলোকের বড়োলোকিপনা দেখাবার একটা উপায়ই ছিল চিনচিলার কোট পরা। কারণ তার ছিল অসম্ভব এক দাম।"

"ওইটুকু প্রাণী দিয়ে কত বড়ো কোট হবে?" মিনু যে সেলাইয়ে ক্লাসে ভালো নম্বর পায়, তার প্রমাণ দেবার চেষ্টা করে।

"আরে একটা চিনচিলা দিয়ে তো আর কোট বানানো হত না। অমন এক একটা কোট বানাতে নিদেন পক্ষে তিনশো চিনচিলার চামড়া ব্যবহার করতে হত। তার মানে, তোর একটা কোট সমান তিনশো চিনচিলার জীবন।"

"ইস, মানুষ কী নিষ্ঠুর!"

"শুধু নিষ্ঠুর? নির্বোধ নয়? এই চিনচিলা নামটা এসেছে কোথা থেকে জানিস?

"একসময় এ অঞ্চলে বাস করত রেড ইন্ডিয়ানদের একটা উপজাতি, তাদের নাম 'চিনচা'। তাদের নাম থেকেই এ প্রাণীর নাম চিনচিলা। এ প্রাণী চিনচাদের খুব প্রিয় ছিল। তারা এর মাংস খেত। আর তারাও চিনচিলার চামড়া ব্যবহার করত। কিন্তু তারা এভাবে তাদের মারত, যাতে এদের বংশবৃদ্ধির হারের চেয়ে তা বেশি না হয়। ফলে চিনচিলাদের সংখ্যা ঠিকই থাকত।

"একসময় এই চিনচাদের হটিয়ে দিয়ে এদেশ দখল করে নিল ইনকারা। ইনকা সভ্যতার কথা তোরা শুনে থাকবি।"

আমায় কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বিল্টু পাকামি করে বলে ওঠে, "হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি, ইনকাদের রাজা আতাহুআল্পার সম্বন্ধে পড়েওছি।"



"হ্যাঁ সেই ইনকারা। তারা আবার চিনচিলার লোম দিয়ে সুতো

তৈরি করে গরম জামাও বানাতে শিখেছিল। অবশেষে এই ইনকাদের হটিয়ে দিয়ে একদিন সে দেশটা দখল করল ইয়োরোপীয়রা। শ্বেতাঙ্গ স্পেনের লোকেরা। ক্ষমতার গর্বে ইয়োরোপীয়রা তখন ফুলেফেঁপে অস্থির। তারা রেখেঢেকে খাওয়ায় অভ্যস্ত নয়। দিকে দিকে তাদের তখন সাম্রাজ্য বিস্তার চলেছে। হাতে অগাধ অর্থ। এই হঠাৎ নবাবদের প্রিয় চিনচিলার কোটের জন্য দক্ষিণ আমেরিকার এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলোর প্রাণ একটু বেশি বেশিই যেতে লাগল। ১৮৯৪ সালে, এক বছরেই সেখান থেকে আট লক্ষ চিনচিলার চামড়া রপ্তানি করা হয়েছিল। কিন্তু মুশকিল হল, ইয়োরোপীয়দের চাহিদামতো তো আর চিনচিলারা বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না। সুতরাং রপ্তানি কমতে লাগল। ১৯০৫ সালে মাত্র চার লক্ষ চামড়া পাওয়া গেল। এভাবে কমতে কমতে ১৯০৯ সালে মাত্র তিরিশ হাজার।"

"এসব সত্যি?"

"সত্যি নয় তো কী? এসব তথ্য সরকারি নথিপত্রেই পাওয়া গেছে।"

"আচ্ছা, সেসব দেশে কি সরকার ছিল না? তারা চিনচিলা মারা নিষেধ করল না কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

"সেসব দেশের সরকারগুলির ঘুম ভাঙল আরও নয় বছর বাদে। ১৯১৮ সালে আইন করে চিনচিলা হত্যা নিষিদ্ধ করা হল। তখন চিনচিলার সংখ্যা গুটি কয়েকে ঠেকেছে। এবার সবার টনক নড়ল। ধরে এনে খাঁচায় পুরে তাদের বংশ বাড়ানোর চেষ্টা চলল। ভাগ্যিস জীব-বিজ্ঞানীরা ছিলেন। এতদিনে তাদের সংখ্যা একটা বলার মতো জায়গায় এসেছে। এবং ভাগ্যিস একাজ হয়েছিল। তাই এখনও আমরা চিনচিলার দেখা পাচ্ছি।"



"কুট্টিমামা, তুমি কিন্তু আসল কথা থেকে সরে গেছ। মার্থা কে তা তো বললে না। আর কেনই বা মার্থা মারা যেতে তুমি পায়রার মাংস খাওয়া ছাড়লে, তাও বললে না।" ভবি ভুলবার নয়। অন্তত মিনু তো নয়ই।

"বলব, বলব, ঠিক সময়েই বলব। তার আগে বল তো মানুষ অন্য প্রাণীকে হত্যা করে কেন?"

"কেন আবার। খাবার জন্য। আমরা হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়া, মাছ সব মারি।" আমার সাফ উত্তর।

"তাহলে মানুষ বাঘ মারে কেন? বাঘ কি খাবার জিনিস?"

"বাঘ তো মারে আত্মরক্ষার জন্য। ঘাড়ের ওপর বাঘ এসে পড়লে মারবে না?" বিল্টুও সাফ জবাব দেয়।

"সে তো আজ দেখছিস, খাদ্যের অভাবে বাঘ গ্রামে ঢুকে পড়ছে। কিন্তু এতকাল ধরে তো বহু বাঘ, সিংহ, হাতি, গন্ডার মারা হয়েছে। তখন তো তারা জঙ্গলেই নিজের মতো থাকত। মানুষ তাদের মারত কেন?"

এবার মিনুও মুখ খোলে, "সে তো মারে শখ করে। শিকার করা এক ধরনের স্পোর্টস।"

"তোদের সবার কথাই কিছু কিছু ঠিক। প্রাচীনতম যুগে মানুষকে প্রাণী হত্যা করতে হত জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য। অন্য প্রাণীদের হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে। সেসময় থেকেই, এবং বিশেষ করে পরবর্তীকালে মানুষ জীব হত্যা করত মূলত জীবন ধারণের জন্য। এভাবেই চলেছিল দীর্ঘকাল। বেশ কয়েক সহস্র বছর।

"ক্রমশ মানুষ সভ্য হল। মানুষ কৃষিকর্ম আবিষ্কার করল। এ হল বড়োজোর গত দশ হাজার বছরের কথা। কি বিশ হাজার। পৃথিবীর বয়সের তুলনায় তো বটেই, এমনকী প্রাণী জগতের ইতিহাসের তুলনায়ও এসময়টা একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্তু এই ভগ্নাংশকালেই মানুষ নামে জীবটা, তার অসংখ্য প্রতিবেশী প্রাণীকুলকে আর উদ্ভিদদের ধরাধাম থেকে মুছে, নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

"সভ্য মানুষই একমাত্র প্রাণী যে বিনা কারণে, তার মানে আত্মরক্ষার জন্যও নয়, বা খাদ্যের জন্যও নয়, সম্পূর্ণ বিনা কারণে শুধুমাত্র খেলাচ্ছলে, ক্ষণিকের আনন্দের জন্য, কিংবা আমার কত ক্ষমতা তা দেখাবার জন্য প্রাণী হত্যা করে। বিনা প্রয়োজনে বিনা প্ররোচনায় মানুষ প্রাণী হত্যা করে।"



"শুধু তাই নয়, আমি পড়েছি, মানুষই নাকি একমাত্র প্রাণী, যে তার নিজের প্রজাতির জীবকে, মানে মানুষকে খুন করে। জীবজগতে নাকি এ ব্যাপারটা আর কারো দ্বারা হয় না।" বিল্টু মাতব্বরের মতো বলে।

কুট্টিমামা কিন্তু কোথায় ওকে পাকা পাকা কথা বলার জন্য ধমক দেবে; তা না, ওকে সমর্থনই করল। "ঠিকই বলেছিস, মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণী সাধারণভাবে তার নিজের প্রজাতির জীবকে মারে না। বড়োজোর ভয় দেখায়, তাড়িয়ে দেয় দল থেকে। তবে সে অন্য কথা। এখন যা বলছিলাম, তাই শোন।"

"আচ্ছা কুট্টিমামা, এভাবে প্রাণী হত্যা করলে কীই বা এমন ক্ষতি? বাঘ, সিংহ, গন্ডার তো আর তেমন উপকারী প্রাণী কিছু নয়!" মিনু জিজ্ঞাসা করে।

প্রশ্নটা আমারও। আমি বলি, "ঠিকই তো। হাতি, গন্ডার, কুমির তো আর খাওয়া যায় না। তাদের বাঁচিয়ে রেখেই বা লাভ কী? বাঘ, সিংহ বরং ক্ষতিই করে। হরিণের মতো সুন্দর এক প্রাণীকে মেরে খায়। কী দরকার ওদের রেখে?"

"এক কথায় এর উত্তর দেওয়া যাবে না। সময় লাগবে অনেকটা। অনেক কথাই বলতে হবে। তার চেয়ে বরং আমারই একটা পুরোনো লেখা থেকে খানিকটা তোদের পড়ে শোনাই—"

পাশের র‍্যাক থেকে কুট্টিমামা একটা ম্যাগাজিন বের করে পড়তে শুরু করে দেয়—

"অনেকেই বলেন, প্রকৃতিও এক জীবন্ত প্রাণী। সাধারণ নয় এক জটিল, মহাজাগতিক অতি-প্রাণী। তার জল, বায়ু, মাটি, গাছপালা, পশুপাখি, পাহাড় পর্বত, নদনদী সবকিছু মিলিয়ে এক মহা ঐকতান সমন্বিত প্রাণী। অবুঝের মতো তার দেহের কোনো অংশ খণ্ডিত করলে, সেই ঐকতান ভেঙে যায়। সুর অ-সুরে পরিণত হয়। তরীর একদিকে মৃদু করাঘাত, অপর দিকের বিরাট সংক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রাসাদ যত দৃঢ়মূলই থাকুক না কেন, তার ভিত থেকে, খুশিমতো যেখান-সেখান থেকে কিছু ইট খসিয়ে নেওয়া চলে না। না ভেবেচিন্তে তা করলে, যে জটিল বিন্যাসের ওপর



প্রাসাদটি গ্রথিত, তার ভারসাম্য নষ্ট হয়, আর তা অচিরেই ধূলিসাৎও হয়।
তেমনি প্রকৃতির বেলায়ও না বুঝে, খেয়াল খুশিমতো তার চলমান ধারায় হস্তক্ষেপ করা চলে না। মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে সবশেষে যে প্রাণীটির আবির্ভাব হয়েছে, অর্থাৎ মানুষ, তার স্থান প্রকৃতির সবার ওপরে এবং সে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান প্রাণী। তার কথাই শেষ কথা। প্রকৃতিকে বশে আনাই তার চরমতম লক্ষ্য। একদিন না একদিন সে এই বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির ওপর প্রকৃত প্রভুত্ব করবে। সেই প্রথমদিনের প্রথম সোজা হয়ে দাঁড়ানো মানুষটি থেকে আজকের একবিংশ শতাব্দীর সন্ধি লগ্নের মানুষটিরও সেটাই পরমতম কামনা।

"কিন্তু অবুঝের মতো নয়। এলোমেলো ভাবে তা করা চলে না। প্রতিটি পদক্ষেপই নিতে হবে অনেক ভেবে। প্রকৃতির ভারসাম্যকে নষ্ট না করে। নইলে কী হয়, তার বহু উদাহরণ আমরা দেখেছি এবং দেখছি। এক সাহারা মরুভূমিই বছরে ষাট মাইল করে এগিয়ে চলেছে। সেই সাহারা, যা একদা পত্রপুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ ছিল। যেখানে ছিল অসংখ্য মানুষের কলকোলাহলে মুখরিত অসংখ্য জনপদ। পৃথিবীর মোট জমির তুষারাবৃত অংশ বাদ দিয়ে, বাকি অংশের শতকরা ছয়ভাগ জমি এখন মরুভূমি। এরও বাইরে আরও শতকরা আটাশ ভাগ জমি মরুপ্রায়। শুষ্ক, উষর, দুর্ভিক্ষ প্রপিড়িত। যা যে-কোনোদিনই মরুভূমিতে পরিণত হতে পারে।

"এসবেরই মূল কারণ কিন্তু মানুষ। এটা তারই অপরিকল্পিত কর্মের ফল। মানুষের নিজেরই জন্য—তার এতদিনের তিলতিল করে গড়ে ওঠা সভ্যতা-সংস্কৃতি বাঁচাতে, তার ইতিহাসকে রক্ষা করতে, ভবিষ্যতে মানুষ নামে একটি প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখতেই প্রয়োজন প্রকৃতির ভারসাম্যের। প্রয়োজন পরিবেশ সচেতনতার। প্রয়োজন প্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণের।"



কুট্টিমামা যে এত সুন্দর করে পড়তে পারে জানতাম না। আমরা তিনজনেই নির্বাক হয়ে শুনছিলাম। পড়া শেষ হতেই তিনজনে একসঙ্গে কথা শুরু করে দিলাম। বিল্টু বললে, "আই বাপ্‌স, কুট্টিমামা! তুমি যে এত দারুণ লেখো বলনি তো কখনো।"

"কোথায় ছাপা হয়েছিল এ লেখা? দেখি দেখি।" আমি হাত বাড়াই।

কুট্টিমামা ঋষিদের মতো হাত তুলে আমাকে নিরস্ত করে।

"ধীরে, বৎস ধীরে। সবই জানবে। ক্রমে ক্রমে জানবে!"

কোন কথা থেকে কোথায় চলে এসেছি, খেয়ালই নেই। মিনু কিন্তু ভুলবার পাত্রী নয়।

"কিন্তু মার্থা?"

"হ্যাঁ, এবার বরং মার্থার কথা বলি।

"আচ্ছা তোরা পায়রার মাংসের কথা বলছিলি না? বল দেখি পৃথিবীতে কতরকম পায়রা আছে?"

কী উত্তর দেব ভাবছি। তার আগে কুট্টিমামাই শুরু করে।

"যেমন ধর, এক ধরনের পায়রাকে বলে গ্রহবাজ বা গেরোবাজ। আঠারো প্রকারের গেরোবাজ আছে। যেমন, 'সবুজ, নীলা, কালো, আবলুক, লাল, প্লেন, কাক্‌জি, কট্‌কি, গাভার, নারো, কাসরা, উদা, ভুরা, খতেন, কাচকড়া, মহাদুম, তাদুম, দোবাজ। এদের প্রত্যেকের আবার দু-তিনটি করে রকমফের আছে। যে কাকজির লাল চোখ তাকে বলে 'মতিচুর'। পায়ে যার পালক, তার নাম 'ঝাপড়া', আবার যদি মাথায় ঝুঁটি থাকে, তখন তার নাম 'চটিয়াল'।

"আর যে পায়রাকে সচরাচর বাড়ির আনাচে-কানাচে তোরা দেখিস তারা হল গোলা পায়রা। তাদেরও সংখ্যা কম না। তারা আছে সতেরো কিসিমের নকশা লক্কা, সিরাজু, বোগদাদ, মুক্‌খি, গুলিখাল, পরপাঁও, সিস্তারু, কড়িয়াল, আউল, ইয়াহু, আক্‌খা, গলাফুলো, কাবরা, মুগিয়া, লোটন, জেকোবিন।

"আরও বহু ধরনের পায়রা আছে। বন্য পায়রাই আছে প্রায় তিনশো রকমের। পণ্ডিতরা বলেন, এসব পায়রাই কিন্তু অতীতের পাহাড়ি পায়রার বংশধর। নানা দেশে, নানা পরিস্থিতিতে এবং সবশেষে মানুষের কারিগরিতে এরা এমন বিভিন্ন রূপ নিয়েছে।



"সে যাই হোক, এইরকমই একধরনের পায়রার নাম ছিল 'যাত্রী পারাবত'; ইংরেজিতে বলত 'প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন'। আজ থেকে পাঁচশো

বছর আগে, যখন সাদা চামড়ার মানুষেরা প্রথম নতুন পৃথিবী অর্থাৎ বর্তমান আমেরিকায় পদার্পণ করেছিল, তখন সে দেশের আকাশ ঢাকা থাকত যাত্রী পারাবতের পাখায়। আর বাতাস মুখরিত থাকত তাদের পক্ষধ্বনিতে।

"এদের গাগুলি ছিল মসৃণ আর স্লেটের মতো কালো। এদের বুকের কাছটা ছিল গাঢ় লাল রঙের। যাত্রী পায়রার ডাকটাও একটু অন্য ধরনের ছিল। আমাদের পায়রার বকবকুম নয়।"

"আচ্ছা, এদের সংখ্যা কত ছিল, হিসেব হয়েছিল কখনো?"
"হয়েছিল। সে দেশের বিখ্যাত অর্নিথোলজিস্ট—বল তো অর্নিথোলজিস্ট মানে কী?"

"পক্ষীতত্ত্ববিদ্। 'হ্যাপি প্রিন্স' গল্পে পড়েছি না!" বিল্টু ঝট করে উত্তর দেয়।

"হ্যাঁ, আমেরিকায় এই পক্ষীতত্ত্ববিদ্যার জনক হলেন বিখ্যাত পণ্ডিত 'অডুবন'। তিনিই মার্কিন দেশে এ বিদ্যা চর্চা শুরু করেছিলেন শুধু নয়, বহু মানুষকে এ বিদ্যা ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন। মানুষকে সচেতন করাও তার বড়ো দান। সে যাই হোক, এই অডুবন এক শহরে এরকম এক যাত্রী পারাবতের ঝাঁক দেখেছিলেন। কত বড়ো ছিল সে ঝাঁক ভাবতে পারিস?

"তিনি লিখেছেন, যাত্রী পারাবতের ঝাঁক তাঁর মাথার উপর দিয়ে ক্রমাগত তিন দিন তিন রাত্রি ধরে উড়ে গিয়েছিল। তাঁরই হিসেব মতো, সে ঝাঁকে ঘণ্টায় তিরিশ কোটি করে পাখি উড়ে গিয়েছিল। আরেকজন পক্ষীতত্ত্ববিদ্ হিসেব করে দেখিয়েছিলেন, অমন অপর এক ঝাঁকে বাইশ শো বর্গমাইল জুড়ে প্রায় সাড়ে তেরো কোটি পাখি ছিল।

"আর একজন পক্ষীতত্ত্ববিদ্ আলেক্সান্ডার উইলসন একবার এক ঝাঁক অমন যাত্রী পারাবত দেখেছিলেন, যাতে তাঁর নিজেরই হিসেব মতো পাখির সংখ্যা ছিল অন্তত দু-শো তেইশ কোটি। এসবই হল গত শতাব্দীর শুরুর ঘটনা। তাহলে ভাব পাঁচশো বছর আগে তাদের সংখ্যা কত ছিল? তবে সব বৈজ্ঞানিকই একমত যে, বিশ শতকের শুরুতে অর্থাৎ একশো বছর আগেও আমেরিকায় যাত্রী পারাবতের সংখ্যা ছিল অন্তত এক লক্ষ কোটি।"





"তাহলে আমেরিকায় পায়রার মাংস খুব সস্তা বলো! ওরাও নিশ্চয়ই খুব পায়রা ধরে খায়।"

"খায় নয়, খেতো। একটু বেশি বেশিই খেত। আর সে কারণেই আজ আমেরিকায় কেন, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও একটিও যাত্রী পারাবত নেই।

"শেষ যাত্রী পারাবতেরই নাম ছিল মার্থা।"

"ও মার্থা তাহলে পায়রার নাম?" মিনু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে। অবশ্য আমি আর বিল্টুও কম অবাক হইনি।

"হ্যাঁ। পৃথিবীর শেষতম যাত্রী পারাবত—মার্থা।"

"শেষতম মানে? অত পায়রা গেল কোথায়? লোকে খেয়ে শেষ করল?"

"ঠিক তাই। এক-একটা পায়রা থেকে কত আর মাংস পাওয়া যায়? একশো থেকে বড়োজোর দু-শো গ্রাম। ভোজের টেবিলে তাই সংখ্যার দিক থেকে তাদের চাহিদাটাও বেশি। শুধু আমেরিকায় নয়, পায়রার মাংস চালান দেওয়া চলল ইয়োরোপেও। ১৮৭৮ সালে একজন মাত্র শিকারি, জাহাজে করে তিরিশ লক্ষ পায়রা রপ্তানি করেছিলেন মিশিগান থেকে।"

"ইস, কী নিষ্ঠুর!"

"এ আর কী নিষ্ঠুরতার কথা। নিষ্ঠুরতা ছিল পায়রা হত্যার পদ্ধতিতে। তাদের বাসার নীচে শুকনো ঘাস জ্বালিয়ে দেওয়া হত। কখনো বা গন্ধক জ্বালানো হত। পাখিরা ভয়ে বা ধোঁয়া সহ্য করতে না পেরে যখন মাটিতে পড়ে যেত, তখন তাদের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারা হত। কখনো বা সাঁড়াশি দিয়ে তাদের মাথাগুলি ছিঁড়ে নেওয়া হত। কেউ কেউ আবার গমের সঙ্গে নেশার জিনিস মিশিয়ে ছড়িয়ে দিত। পায়রারা সেই গম খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে, লাঠিপেটা করে তাদের হত্যা করা ছিল আর এক কায়দা। কেউ কেউ আবার ফাঁদ পেতে পায়রা ধরত। সে ফাঁদে কতকগুলি পায়রাকে আগে থেকে বেঁধে রাখা হত। তাদের চোখগুলিকে দেওয়া হত শেলাই করে। এবার তাদের দেখে অন্য পায়রারা ফাঁদের উপর নেমে এলে, আবার সেই লাঠি পেটা। কে কত নৃশংস হতে পারে, তার প্রতিযোগিতা!"



"এত পায়রাকে এভাবে মেরে ফেলল?"

"নিশ্চয়। একশো বছরও লাগল না। সব শেষ!"

"আর মার্থা?"

"সেটা ছিল সেপ্টেম্বরের পয়লা তারিখ। বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। তোদের তখনও জন্ম হয়নি! আমেরিকার সিন্‌সিন্নাতি চিড়িয়াখানায় আর সকলের সঙ্গে আমিও দাঁড়িয়ে।"

বিল্টুটা বড্ড বেরসিক। তবে চালাক যে তাও ঠিক। "ও কুট্টিমামা, তুমি আবার কবে আমেরিকায় গেলে?"

"বললাম না। তোদের জন্মের আগের কথা এসব। এখন শুনবি? না, বন্ধ করব মার্থার কাহিনি!"

"না, না। তুমি বলো। আমরা শুনছি।" আমি আর মিনু এক সঙ্গে বলে উঠি।

"আমেরিকার সিনসিন্নাতি চিড়িয়াখানা। সেপ্টেম্বরের ঠান্ডা হিমেল হাওয়া বইছে। আমাদের দেশে বলে শরৎকাল। ওদের ফল (fall)। শীতের কামড় আসতে আর কিছুদিন বাকি। মনটা কেমন উদাস হয়ে যায় এমন এক আবহাওয়া। দেশে থাকলে বাতাসে কেমন পুজো পুজো গন্ধ আসে। কিন্তু আজ এখানে সবাই বিষণ্ণ। সবার যেন মন খারাপ। কিছুই ভালো লাগছে না। তার মধ্যে চলছে ডাক্তারদের ছুটোছুটি। না, এঁরা মানুষের ডাক্তার নন। পশুপাখির ডাক্তার। হাজির অসংখ্য বৈজ্ঞানিক। সবারই যেন চোখ ছলছল করছে। আমি গরমের দেশের মানুষ। তাই বেশ শীত শীতই করছে। শীত কাটাতেই হোক, কী টেনশন দূর করতেই হোক, একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে চলেছি। আশেপাশে তাকিয়ে দেখি, প্রায় সকলেই অমন টেন্‌স্‌ড্‌ হয়ে আছে। যাদের আগে কখনো সিগারেট খেতে দেখিনি, তাদেরও দু-চারজনকে সিগারেট ধরাতে দেখলাম।

"উৎকণ্ঠা ক্রমশ চরমে পৌঁছোচ্ছে। অত সকালেও চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষের ঘরের সামনে অতগুলো মানুষ হাজির। ভাবলেই অবাক লাগে।



"কিন্তু কেন? কীসের প্রতীক্ষায়? কী তাদের এত উৎকণ্ঠা? কারণটা মার্থা! পৃথিবীর শেষতম যাত্রী পারাবত।

"মার্থা আজ মৃত্যুপথ যাত্রী। বড়ো বড়ো ডাক্তাররা শেষ চেষ্টা করে চলেছেন।

"কিন্তু না, ভোরের আলো ফোটার মুখে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার-বাবুরা। শেষ রক্ষা করা গেল না।

"মার্থা আর নেই। পৃথিবীতে আর কোনো যাত্রী পারাবত রইল না। তোদের জেনারেশানের ছেলেমেয়েরা আর দেখতে পেল না স্লেট রঙের সেই পায়রাদের, যাদের বুকের কাছটা গাঢ় লাল।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কুট্টিমামা শেষ করে তার কথা।

"যা এবার তোরা বাড়ি যা। বাড়িতে নইলে ভাববে। ছোড়দিদিকে আর এসব কথা বলতে হবে না। বলবি কুট্টিমামা এল না। ব্যস।"

নিঃশব্দে বের হয়ে এলাম আমরা তিন ভাইবোন। মনটা আমাদেরও কেমন যেন হয়ে গেল।

* * *

রাতে খেতে বসে মাংসের বাটিটা সরিয়ে রাখতে রাখতে মিনু বলল, "বড়োমা, আমি মাংস খাব না।"

"সে কী রে? তোরাই তো খেতে চেয়েছিলি। তাই না পায়রার মাংস আনা। খাবি না কী রে? শরীর ভালো আছে তো? পেট?"

"না না, আমার কিছু হয়নি। মাংস খেতে ভালো লাগছে না।"

"দেখি কপালটা।" মা তবু বিশ্বাস করেন না।

"বড়োমা আমার বাটিটাও সরিয়ে নাও।" বিল্টু জানায়।

"আমারটাও," অগত্যা আমাকেও বলতে হয়।

"তোদের হল কী?" মা তো অবাক।

* * *

আরও রাতে আমার পড়ার ঘর থেকে শুনছি বাবা খাবার টেবিলে গল্প করছেন। কাকার গলাও পাচ্ছি।

মা যথারীতি রিপোর্ট করলেন আমাদের মাংসের বাটি সরিয়ে রাখার।

বাবা বললেন, "সে কী? খায়নি কেন? ওরাও কি কুট্টির চেলা হল নাকি? ওরাও কি হোমিওপ্যাথি করছে?"



কাকা জিজ্ঞাসা করলেন, "তার মানে? কুট্টি কি মাংস খাচ্ছে না?"

বাবা বললেন, "না, আজই গিয়েছিলাম। তা শাশুড়ি ঠাকুরণ বললেন, কুট্টি নাকি কি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাচ্ছে। তাই তার মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন সব বন্ধ। একমাস খাচ্ছে না। সেজন্যই তো আজ বাবু আসেননি। নইলে তার ছোড়দির হাতের পায়রার মাংস সে ছেড়ে দিত?"

"সেকী, বিল্টুরা তো সে কথা আমায় বলেনি!" মা বললেন।

"ওরা হয়তো জানেই না!"

আর শোনার দরকার নেই। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, বিল্টু। হাতে তার একটা কী বই। সেও সব কথা শুনেছে।

"দেখলে দাদা, কুট্টিমামার গুল্প? জেঠু ঠিকই বলে। তবে দেখো, মার্থার ঘটনা কিন্তু ঠিক। অবশ্য সে ব্যাপারেও একটু গুল। মার্থার ঘটনা ১৯১৪ সালের। এই দেখো। এ বইতে আছে। আজ থেকে পঁচাশি বছর আগে। কুট্টিমামা কেন, বড়োমামার জন্ম হয়েছে তখন?" হাতের বইটা আমার দিকে এগিয়ে দেয় বিল্টু।

কোনো মানে হয়? এভাবে আমাদের মাংস খাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার?

বাবার ঘরে গিয়ে ফোনে ধরলাম কুট্টিমামাকে।

"না বোঁচনবাবু, আমার উপস্থিতি ছাড়া বাকি সব কথাই তো ঠিক। আসলে একটু কাহিনি-টাহিনি করে না বললে তোদের ভালো লাগবে কেন? তবে ছোড়দির হাতের রান্না পায়রার মাংস না খেয়ে তোমরা অবশ্যই ভুল করেছ। হোমিওপ্যাথির ব্যাপারটা না থাকলে আমি তো কখনোই ছাড়তাম না!"



প্রাণীদের আবাস

সেদিন খেতে বসে বাবা বললেন, "বহুকাল আমরা চড়ুইভাতি করি না। কোথাও একটা গেলে হয়।"

মিনু সবে তখন মুরগির ঠ্যাংটা কায়দা করে ধরেছে। তাড়াতাড়ি মুখ থেকে মাংসটা নামিয়ে বলে, "আমি কক্ষনো যাব না। অ্যা মা, চড়ুই কেউ ভাতে খায়? ছিঃ। তোমরা খাবে খাও।"

ওর কথা শুনে আমরা হেসেই অস্থির। মা বললেন, "হাসছিস কেন? ওর দোষ কী? ও কি এসব কথা শুনেছে নাকি। আজকাল তো বনভোজন উঠেই গেছে।"

বিল্টুটা ফাজিল। বললে, "কিছু বুঝলি মিনু? বড়োমা খান্ডবদহনের কথা বলছেন। গোটা বনটাকে পুড়িয়ে ময়দানবের মতো ভোজন করা।

আবার হাসির হর্‌রা। "ফাজলামি কোরো না। আমি জানি বনভোজন মানে। তার মানে পিকনিক।"



কাকা বললেন, "হ্যাঁ, বাংলা করে বললে picnic-ই বটে। কী অবস্থা দেখো ছেলেমেয়েদের। বাংলা কথা জানে না। ইংরেজিটি শিখেছে। এসব কাণ্ড কিন্তু ইংরেজরা এদেশ থেকে যাবার পরেই বেড়েছে।"

মিনুর এই চড়ুইভাতির গল্প আমার মামাবাড়িতেও কী করে পৌঁছোল কে জানে! শনিবার বিকেলে ও বাড়িতে যেতেই বড়োমামি মিনুকে নিয়ে পড়লেন।

"হ্যাঁরে মিনু, তুই নাকি চড়ুইপাখি ভাতে খেতে চেয়েছিস?"

"মোটেই না! ওই দাদা আর বড়দা খেতে চেয়েছে। ছিঃ, চড়ুইপাখি কেউ খায়?"

"চড়াইপাখি নিয়ে কী কথা হচ্ছিল?" কুট্টিমামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন করে।

"নে, তোদের পাগলামামার সঙ্গে তোরা গল্প কর। ততক্ষণ আমি দেখি, কেকটা হল কি না।"

আজ মিনুর জন্মদিন বলে আমাদের এ বাড়িতে নেমন্তন্ন। বিল্টু মিনুর মামাবাড়ি সেই শিলিগুড়িতে। আমার মামাবাড়ি ওদেরও মামাবাড়ি। আমার কোনো মামাতো ভাইবোন নেই। তাই এ বাড়িতে আমাদের আবদার একটু বেশি। বিশেষ করে বড়োমামির কাছে। মেজোমামারা বিদেশে থাকে। আমার দিদা আর কুট্টিমামা—ওদেরও। অবশ্য ওদের শিলিগুড়ির মামাবাড়িতেও আমার খুব আদর। তবে যাওয়া তো হয় না বিশেষ। হয়তো দু-বছরে একবার। আমি কলেজে উঠেছি বলে, এবছর তাও হবে কি না সন্দেহ। বাবা বোধ হয় যেতে দেবেন না এবার।

"হ্যাঁ চড়াইপাখির কথা কী হচ্ছিল?" কুট্টিমামা জিজ্ঞাসা করে।

"ওই তো দাদা আর বড়দা চড়াই পাখি ভাতে খাবে বলেছে।" মিনু তাড়াতাড়ি জবাব দেয়।

"না গো কুট্টিমামা। জেঠু চড়ুইভাতির কথা বলেছিলেন, তাইতে মিনু ভেবেছে বুঝি চড়াইপাখি ভাতে খাওয়া হবে।" বিল্টু ব্যাখ্যা করে।

"চড়াইপাখি নিয়ে অত ঠাট্টা ইয়ারকি কোরো না। অমন এক চড়াই জাতীয় পাখি দেখেই ডারুইন সাহেব তাঁর থিয়োরি তৈরি করেছিলেন।"



"কী যে বলো। ডারুইন তো আবিষ্কার করেছেন, বাঁদর থেকে মানুষ হয়েছে। তাই না বড়দা?" বিল্টু আমায় সাক্ষী মানে।

আমি জবাব দেবার আগেই কুট্টিমামা বলে, "একে আবিষ্কার বলে

না বিল্টুবাবু। বলো প্রমাণ করেছিলেন। বাঁদর থেকে নয়, বাঁদর জাতীয়
প্রাণী থেকে। কিন্তু সে তো ল্যাজের কথা। আগের অংশটা দেখো!"

"কী শুনি আগের অংশটা।"

"তাহলে তো তোমাদের ডারুইন সাহেবের লেখা বইটার, থুড়ি বই দুটোর কথা বলতে হয়।"

"কী যে বলো না, কুট্টিমামা! ডারুইনের তো একটা বই, 'ওরিজিন অফ স্পিসিস।' দুটো কেন হবে?" বিল্টু তার বিদ্যে ফলায়।

"না বৎস। তোমার জ্ঞান অসম্পূর্ণ। ডারুইন সাহেবের অনেক গুলিই বই, অসংখ্য লেখা। শুধু জীববিদ্যার ওপর নয়। ভূতত্ত্বের ওপরও তাঁর বই আছে। যাই হোক, আমি এখানে তাঁর দুটি বিখ্যাত বইয়ের কথা বলছি। প্রথমটি হল, দু-ভল্যুমের। নাম-'জার্নাল অফ এ ন্যাচারালিস্ট, জুলজি অফ দি ভয়েজ অফ দি বিগল।' এ বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩৯ সালে। এ হল 'বিগল' জাহাজে ভ্রমণকালে তিনি যেসব তথ্য পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, তার বিবরণ। তাঁর সবচেয়ে বড়ো কাজ ও সবচেয়ে বিখ্যাত বই প্রকাশিত হয় এর ঠিক বিশ বছর বাদে ১৮৫৯ সালে, ২৪শে নভেম্বর। এ বই-এর নামটাও একটু বড়োসড়ো, 'অন দি ওরিজিন অফ স্পিসিস বাই মিনস অব ন্যাচারাল সিলেকশন, অর দি প্রিসার্ভেশন অফ ফরোয়ার্ড রেসেস ইন দি স্ট্রাগল ফর লাইফ।' প্রথমে ছাপা হয়েছিল ১২৫০ কপি বই। প্রথম দিনেই সেই ১২৫০ কপি বিক্রি হয়ে যায়।

"যাই হোক, আমরা কথা বলছি প্রথম বইটা নিয়ে।"

"ওঃ তাহলে প্রথম বইটা, মানে 'ভয়েজ অব দি বিগল', চড়াইপাখি নিয়ে?"

"আমি কি তাই বললাম? প্রথমত চড়াই নয়; চড়াই জাতীয় পাখি। দ্বিতীয়ত, অনেক অনেক তথ্য আছে সে বইতে। তার মধ্যে একটি তথ্য তোমাদের বলব। সেটা এই চড়াই-এর মতো দেখতে 'তুতি' পাখিদের সম্বন্ধে।"



"তুতিপাখি? নাম শুনিনি তো পাখিটার।"

"শুনবি কী করে? এখনও অবশ্য গ্রামাঞ্চলে শীতকালে এদের দেখা যায়। এরা পরিযায়ী পাখি। মানে বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে থাকে। এদেশ থেকে ওদেশে উড়ে যায়। এরা কিন্তু চড়াই নয়। এরা তুতি। তুঁত ফল খেতে ভালোবাসে বলে এদের নাম তুতি। ইংরেজিতে এদের নাম ফিঞ্চ (finch)। দাঁড়া তোদের একটা বই দেখাই।" বলে কুট্টিমামা উঠে গেল।

বইটা নিয়ে এসে একটা পৃষ্ঠা বের করে বলে, "পড় এখান থেকে।"

উলটে দেখি বইয়ের লেখক 'জগদানন্দ রায়'।

'পাখিগুলি দেখিতে কিন্তু অতি সুন্দর। ইহাদের পিঠের পালকের রং খয়েরি, কিন্তু বুক, গলা ও মাথার রং গোলাপি। ইহা পুরুষ পাখির গায়ের রং। স্ত্রী পাখিদের পালকে কিন্তু এত রঙের বাহার দেখা যায়না।'

"ব্যস, এই পর্যন্ত। তাহলে দেখ; জগদানন্দ কিন্তু নিজের চোখে এসব পাখি দেখেছিলেন। তার বর্ণনাও দিয়েছেন। এই হল ফিঞ্চ।

"যে ফিঞ্চ পাখিটি আমাদের দেশে সাধারণত দেখা যায়, তার নাম 'হজ্‌সন্স রোজ ফিঞ্চ'। এদের বৈজ্ঞানিক নাম 'কর্পোডেকাস ইরাইথ্রিনাস' (Corpodacus Erythrinus)। শীতকালে আমাদের এখানে এদের দেখা গেলেও, এরা সাধারণত বাস করে আর বংশবৃদ্ধি করে কাশ্মীর উপত্যকায় ও পশ্চিম হিমালয়ে। সাধারণত এরা বট, পিপুল, ডুমুর, বাঁশ ইত্যাদি গাছের ফল খেতে ভালোবাসে। আর ভালোবাসে জোয়ার, তিসি, বাজরা প্রভৃতি শস্য। এ ছাড়াও এরা শিমুল বা পাঙ্‌রা জাতীয় ফুলের মধু পছন্দ করে।"

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু তার সঙ্গে ডারুইনের কি সম্পর্ক?"

"আছে বলেই তো বলছি। ১৮৩৫-এর সমুদ্র যাত্রায় ডারুইন বিগল জাহাজে করে যেসব দেশে গিয়েছিলেন তার মধ্যে দুটি জায়গা খুব বিখ্যাত হয়ে আছে। আছে তাঁর জন্যই। এ দুটি হল দুটো দ্বীপ। গ্যালাপাগোস আর কোকোস।



"দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তের একটি দেশ হল ইকুয়েডর। দ্বীপ দুটি বিষুবরেখা বরাবর, ইকুয়েডরেরও পশ্চিমে। মূল ভূখণ্ড থেকে বেশ

দূরে। এখানেই নানা পশুপাখি গাছপালা দেখে ডারুইন সাহেবের মাথায় উকিঝুঁকি দিতে শুরু করে, তাঁর সেই বিখ্যাত মতবাদ 'সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট' । অর্থাৎ 'যোগ্যতমের টিকে থাকার মতবাদ।'

"ডারুইন লক্ষ করলেন গ্যালাপাগোসে আছে অসংখ্য ফিঞ্চ পাখি। এদের সবার গোত্র (family) এক। কিন্তু প্রজাতি (species) বা গণ (genus) বিভিন্ন।

"কিন্তু অদ্ভুত! এই ফিঞ্চরা নানা ধরনের। তাদের ঠোঁট, আকৃতি সবই বিভিন্ন। ডারুইন নিজে সে দ্বীপে তেরোটি প্রজাতির ফিঞ্চ দেখেছিলেন। এই তেরোটি কেন, তা নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলেন, এদের সবারই পূর্বপুরুষ এক ও অভিন্ন। প্রশ্ন জাগল এরা বিভিন্ন ধরনের হল কেন?

"ডারুইন লক্ষ করলেন, এদের খাদ্যাভ্যাস ভিন্ন ভিন্ন। কেউ খায় মাটি থেকে খুঁটে, কেউ বা গাছ থেকে; আবার কেউ দু-জায়গাতেই। কোনো প্রজাতির 'ঠাঁই টিয়া আবার কেউ ন এরা বাদামের শক্ত খোলা ভেঙে বীজটা খায়। কেউ আবার খায় পোকামাকড়। তাদের ঠোঁটও সে কাজের মতো করে তৈরি। আবার বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন স্থানের পোকা খাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের ঠোঁট। ঠিক যেন সাহেবি হোটেলের খানা। বিভিন্ন খাবারের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাঁটাচামচ।

"কারো ঠোঁট কাঠঠোকরার মতো, কারোর বা কাদাখোঁচার মতো। যাদের ঠোঁট কাঠঠোকরার মতো, তাদের আবার কাঠঠোকরার মতো লম্বা জিভ নেই। তারা মুখে করে ক্যাকটাসের কাঁটা নিয়ে আসে। তাই দিয়ে গেঁথে গেঁথে পোকা খায়। অনেকটা টুথ্‌পিক দিয়ে গেঁথে ফলের টুকরো মুখে দেবার মতো।

"যে তিনটি প্রজাতি মাটি থেকে খুঁটে খায় তাদেরও ঠোঁটের আকার বিভিন্ন ধরনের। আবার এই খাদ্যাভ্যাসের কারণেই তাদের দেহের বাইরের আর ভেতরের গঠনও নানা ধরনের। এদের নামই দেওয়া হয়েছে 'ডারুইন ফিঞ্চ।'"



"অন্য দেশের ফিঞ্চরাও কি এরকম?"



"তারা কী খায়, তা তো জগদানন্দের লেখাতেই পড়লি।"

"তাহলে গ্যালাপাগোসের পাখিরা এমন নানা রকমের হল কেন?"

"সেটাই তো ডারুইন ভাবতে বসলেন। তাই তো! এত বিচিত্র ফিঞ্চ কোথা থেকে এল? আর তো কোথাও এমন বৈচিত্র্য নেই। তাহলে?"

"ওই যে বললে, খাবারের জন্য।" বিল্টু বলে ওঠে।

"ঠিক ধরেছিস। আসলে মনে করা হয় গ্যালাপাগোস দ্বীপটা একসময় মূল ভূখণ্ডের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। ফিঞ্চরাও ছিল। কালক্রমে ভূতাত্ত্বিক কারণে সে দ্বীপ আরও পশ্চিমে সরে গেল। এখন মূল ভূভাগের সঙ্গে তার অনেক দূরত্ব। কিন্তু কিছু পাখি তো দ্বীপে রয়ে গেল। তারা বংশ বৃদ্ধিও করতে লাগল। ফলে এদের অভ্যস্ত খাবারে পড়ল টান। তখনই শুরু হল বাঁচবার জন্য সংগ্রাম—স্ট্রাগল ফর এক্‌জিস্‌টেন্স। তাই খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হল কাউকে কাউকে। আর সেই খাদ্য খাবার তাগিদে দৈহিক পরিবর্তন এল। যাকে ফল খেতে হয়, আর যাকে বাদাম খেতে হয় কিংবা যাকে পোকা খেতে হয় সবার ঠোঁট তো এক হলে চলে না। খাদ্যের কারণে দৈহিক গঠনে পরিবর্তন এল। পরিবর্তন এল ভেতরের প্রত্যঙ্গেও। কালক্রমে এরা হয়ে পড়ল বিভিন্ন প্রজাতি। এমনকী আলাদা গণও।"

"সব প্রাণীর বেলায়ই কি তা হয়?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

"নিশ্চয়। সব প্রাণীর বেলায়। যেখানে যে প্রাণী বাস করে, তার প্রকৃতি, আবহাওয়া, সর্বোপরি খাদ্য প্রাণীদেহে পরিবর্তন আনে। তাকে তো বেঁচে থাকতে হবে। জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে হবে। সবকিছুর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে না নিলে চলবে কেন?"

"ঠিকই। সেজন্যই বোধ হয় শীতের দেশের প্রাণীদের শরীরে অত লোম।" বিল্টু যোগ করে।

"হ্যাঁ। আর্মাডিল্লোর মুখ ছুচোঁলো, কারণ তাকে পিঁপড়ে আর উই খুঁটে খেতে হয়। মধুপায়ী পাখিদের ঠোঁট সরু আর ছুঁচোলো। কারণ ফুলকে নষ্ট না করে তাকে ফুলের মধু নিতে হয়। জিরাফের গলা লম্বা। কারণ তাকে উঁচু গাছ থেকে পাতা জোগাড় করতে হয়, খাবার জন্য। একারণেই এদের প্রত্যেকের থাকার জায়গাগুলো আলাদা আলাদা। শ্বেত



ভল্লুক মেরু দেশে থাকে, সিলমাছ জলে, মৌমাছি থাকে ফুলের বনের কাছাকাছি। এগুলোই এদের 'হ্যাবিটাট' (habitat)। বাংলায় বলা চলে আবাস ভূমি।"

আমি এসব কিছু কিছু পড়েছি। নতুন কলেজে গিয়েছি। এসব না জানা নয়। বললাম, "ইকোলজি (Ecology) তো এরই চর্চা!"

"কারেক্ট। বাংলায় বলা হয় 'বাস্তুসংস্থান বিদ্যা'।"

"বড্ড খটমট। ইকোলজি বলা সোজা।" মিনু স্বীকার করে।

"কিন্তু ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলো তো কুট্টিমামা। ঠিক বুঝলাম না।" বিল্টু জানতে চায়।

"কলেজে ওঠ। তখন বুঝবি। এখনই সব বুঝবি কী করে।"

"না রে। বোঁচন যাই বলুক, এসব বুঝতে অত বিদ্যে লাগে না। তুই তো আর এবিষয়ে পণ্ডিত হতে যাচ্ছিস না। সহজ ভাষায় সরল ভাবে বললে, বুঝবি না কেন?

"আচ্ছা আমি বুঝিয়ে বলছি ঃ পণ্ডিতেরা বলেন, পৃথিবীর জন্ম হয়েছে অন্তত সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো কোটি বছর আগে। প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে তারও অন্তত একশো কোটি বছর বাদে। এরপরে আরও একশো কোটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে সেইসব প্রাণের জন্য, যারা সালোকসংশ্লেষকারী। তার মানে যারা সূর্যের আলোর সাহায্যে নিজেদের খাবার নিজেরাই বানিয়ে নিতে পারে। যেমন সবুজ গাছ পারে। কেটে গেল আরও অন্তত দু-শো কোটি বছর, কিংবা আরও বেশি। অর্থাৎ মাত্র পঞ্চাশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর ভূভাগে প্রথম প্রাণের উন্মেষ হল। তার মানে ডাঙায় প্রাণ জন্মাল পৃথিবীর বয়সের দশমাংশের নয়ভাগ কেটে যাওয়ার পরে।"

"ধ্যুৎ, কী যে বলো না কুট্টিমামা! তাই কখনো হয়? তাহলে মানুষ এল কবে?" মিনু জানতে চায়।



"মানুষ? মানুষ তো এল এই সেদিন। মাত্র দু-লক্ষ বছর আগে। তখন ঠিক মানুষ বলব না, বলব যে বনমানুষেরা দু-পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে শিখল, আর যাদের সামনের হাত দুটো কাজে লাগল। আধুনিক

মানুষের জন্ম আরও পরে। এরও এক লক্ষ আশি হাজার বছর বাদে, অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র হাজার বিশেক বছর আগে।

"যাই হোক, এই ক্রমবিকাশের ধারাকেই ব্যাখ্যা করেছিলেন ডারুইন, তার অভিব্যক্তিবাদ দ্বারা। ইংরেজিতে বলেছিলেন 'দি থিয়োরি অব ইভোলিউশন'। বাংলায় ক্রমবিবর্তনবাদও বলা হয়। ডারুইনের সঙ্গে আর একজন বৈজ্ঞানিকের নাম না বলা অন্যায় হবে। তাঁর নাম আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেশ। অকৃত্রিম সুহৃদ। তাদের দুজনের এসব কাজের ফলে পৃথিবী আর তার প্রাণী জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটাই পালটে গেল। যদিও তাঁদের আগে বহু দার্শনিক অনেক কথা বলে গেছেন, যার অনেকটাই সত্য। কিন্তু বিজ্ঞান দিয়ে, বৈজ্ঞানিক সত্য দিয়ে তা কেউ প্রমাণিত করতে পারেননি।

"যেমন ধর, সেই সপ্তদশ শতকেই দার্শনিক স্পিনোজা বলেছিলেন, 'প্রকৃতি শূন্যতাকে ঘৃণা করে' (Nature abhors vacuum)। তার মানে প্রকৃতিতে কোনো স্থান শূন্য থাকতে পারে না। আজ আমরা তা বৈজ্ঞানিক সত্য বলেই জানি।"

"বলতে বসলে ইকোলজি, তা না যত খটমট সব কথা। কিছুই বুঝছি না।" মিনু সাদামাটা অভিযোগ করে।

"বুঝবি, বুঝবি, বুঝবি না কেন? মন দিয়ে শোন, সবটা এখন না বুঝলেও, পরে বুঝবি।" আমি ওকে আশ্বস্ত করি।

"ঠিকই বলেছিস বোঁচন। যাকগে ইকোলজির কথাই বলি। ইকো কথাটি কোত্থেকে এসেছে জানিস?"

"জানি, জানি। ইকো মানে প্রতিধ্বনি।"

"দুর বোকা। সে হল এক গ্রিক উপদেবীর নাম। তার বানান ই সি এইচ ও। আর এ হল ই সি ও। এও এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে। ওইকস —তার মানে আবাস।



"প্রত্যেক প্রাণীরই একটি আবাস আছে—হ্যাবিটাট। একটা বিশেষ প্রজাতির প্রাণী যেখান থেকে তার আহার সংগ্রহ করে, যেখানে তার বংশবৃদ্ধি করে তাকেই বলে হ্যাবিটাট। যেমন ধর শ্বেত ভল্লুকের আবাস

বরফের দেশে। কিন্তু চিড়িয়াখানায় একটা শ্বেত ভল্লুক আছে বলে সেটা তার আবাস নয়। সুন্দরবন রয়াল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল। মাছের আবাস স্থল হল জল। কারো মিষ্টি জল, কারো লোনা জল বা সমুদ্র। পমফ্রেট মাছ লোনা জলের। আবার রুই কাতলা মিষ্টি জলের।"

পমফ্রেট বলতেই আমার ফিশফ্রাই-এর কথা মনে পড়ে গেল। "লোনা জলের মাছের ফ্রাই খেতে খুব ভালো, না কুট্টিমামা?"

"তার কোনো মানে নেই। পুঁটি মাছও ভাজা খেতে ভালো। তা বলে পুঁটি মাছ তো আর সমুদ্রে হয় না। তার আবাসস্থল ধানখেত আর পুকুর।"

"তাহলে এক-এক প্রাণীর জন্য এক-এক আবাস, তাই না?" বিল্টু মত দেয়।

"না, তা কেন? একই জায়গা একাধিক প্রাণীর আবাস হতে পারে। সুন্দরবনে বাঘও থাকে, হরিণও থাকে, শুয়োরও থাকে। মূলত খাদ্যাভ্যাসই প্রাণীর আবাসস্থল ঠিক করে। পৃথিবীতে মানুষ, মাছি, ইঁদুর ইত্যাদি সামান্য কটি প্রাণী ছাড়া বাকিদের আবাস কিন্তু মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট।

"এই আবাসকে আবার কতকগুলি কুলুঙ্গিতে ভাগ করা হয়। ইংরেজিতে বলে নিচ্ (niche)। তার মানে আনাচ-কানাচ। প্রকৃতির নিয়মই এমন যে, এই আনাচ-কানাচ কোনো সময় খালি থাকে না। কোনোটা কোনো কারণে খালি হলেই, কেউ না কেউ অর্থাৎ কোনো না কোনো প্রজাতি এসে তা ভরতি করে। যেমন করেছে ডারুইন ফিঞ্চরা।

"হাওয়াই দ্বীপে তেইশ রকমের প্রজাতির মধুপায়ী পাখি আছে, এক গোত্রের হলেও, যাদের ঠোঁটের গড়ন একেবারে আলাদা। গায়ের রংও বিভিন্ন। আসলে এরা বিভিন্ন আকৃতির ফুলের থেকে মধু সংগ্রহ করে। তাই তাদের ঠোঁটও বিভিন্ন। প্রকৃতি এমনি সব বৈচিত্র্যে ভরা।"



কুট্টিমামার কাছ থেকে আরও হয়তো কিছু শোনা যেত। কিন্তু বড়োমামি এসে তাগাদা দিলেন, "খেতে আয় তোরা। বাড়ি যাবি তো!"

খাবার ব্যাপারটা থাকলে সেটা আগেই সেরে নেওয়া উচিত। তাই এবার আমি তাগাদা দিলাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ চলো। খাবার ঠান্ডা হয়ে যাবে।"



"কে বলেছে স্বীকার করা খারাপ? তুমি অন্যায় করবে, অপরাধ করবে, তা স্বীকার করে নিতে দোষ কোথায়?"

"ধ্যুৎ সে স্বীকার করার কথা কে বলছে? আমরা বলছি শিকার করার কথা। প্রাণী হত্যা করা।" বিল্টু বোঝাতে চেষ্টা করে।

"তাই বা খারাপ কেন হবে? বিসর্জন পড়িসনি?

'কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ?
এ জগৎ মহা হত্যাশালা।
জানো না কি প্রত্যেক পলকপাতে
চির আঁখি মুদিতেছে
লক্ষ কোটি প্রাণী?
সে কাহার খেলা?'

এ জগৎটাই তো শিকার আর শিকারির খেলা।"



"তুমি বলছ শিকার করা ভালো? এই সেদিন বললে অনাবশ্যক আর অত্যধিক শিকার করে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করছে মানুষ। আবার এখন অন্য কথা বলছ? তোমার কোনো কথার ঠিক নেই কুট্টিমামা।"

"কথা ঠিকই আছে বৎস। তুমি নিজেই স্বীকার করলে, আমি শুধু শিকার বলিনি। অনাবশ্যক ও অত্যধিক শব্দ দুটিও তার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলাম। ও দুটি শব্দই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

আসলে আমাদের পড়ার ঘরে জোর তর্ক চলছিল বিল্টু-মিনুর মামাতো ভাইদের সঙ্গে। তারা বিল্টুদের আপন মামাতো ভাই নয়। কাকিমার ছোড়দাদুর নাতি। বিল্টুটা ফাজিল, বলে 'খুড়তুতো মামাতো ভাই'। একজন স্কুল ফাইনাল দিয়েছে, অন্যজন বিল্টুরই সমবয়সী।

কাকিমার সেই ছোড়দাদু ছিলেন থানার দারোগা। তার দাপটে নাকি বাঘে-গরুতে সত্যিই একঘাটে জল খেত। তার ওপর তিনি ছিলেন এক বিখ্যাত শিকারিও। শিলিগুড়িতে বিল্টুদের মামাবাড়ির দেওয়ালে তাঁর শিকারের অনেক নিদর্শনও আছে। সম্বরের মাথা, বাঘের চামড়া, হাতির পা ইত্যাদি। আমিও দেখেছি।

বিল্টুর অবশ্য বক্তব্য, ওসবের অনেকটাই জোগাড় করা। তখনকার দিনের সব বড়োলোকেরাই তাই করত। আর শিবেন্দ্রনারায়ণের মতো অত জাঁদরেল দারোগা করবে না? তবে এ মত অবশ্য বিল্টু শুধু আমার কাছেই প্রকাশ করেছে। তোমাদের বলে দিলাম বলে, তোমরা আবার ওর সেই 'খুড়তুতো মামাতো' ভাইদের বলে দিয়ো না যেন!

ঝন্টু-পিন্টু—দুটোই মহা বিচ্ছু। তার ওপর বড্ড তর্ক করতে পারে। এমনকী বড়োদের সঙ্গেও তর্ক করে। তার জন্য কাকিমা অবশ্য মনে মনে ওদের পছন্দ করেন না। তবে ভাই-এর ছেলে তো! ফেলতেও পারেন না। ঝন্টুর পরীক্ষা হয়ে যাওয়ায় দু-ভাই কলকাতা দেখতে এসেছে। সাহস আছে বটে! দু-ভাইকে শিলিগুড়িতে ট্রেনে চড়িয়ে দিয়েছে। কেমন একা একাই চলে এল। অবশ্য কাকা নিজে গিয়ে শিয়ালদা থেকে নিয়ে এসেছেন ট্যাক্সি করে।

তবে আমি বুঝি না, কলকাতায় কী এত দেখবার আছে? আগেও তো দেখেছিস কলকাতা। হোক না তিন বছর আগে। কলকাতা তো আর নতুন কিছু নয়! সেই জাদুঘর, সেই চিড়িয়াখানা, মেট্রো রেল, ভিক্টোরিয়া এই তো! তোদের শিলিগুড়িতে বরং দেখবার অনেক কিছু আছে। হংকং মার্কেটে গেলেই তো দিন কেটে যায়।



কলকাতা ঘুরে দেখাও হয়ে গেছে। ওরা রয়ে গেছে। আরও সাতদিন থাকবে। কাজ নেই। তাই শুধু তর্ক করে যাচ্ছে। বিল্টুটাও তর্ক করতে পারে বটে! কুট্টিমামার কাছ থেকে শেখা খাদ্যশৃঙ্খল, প্রাকৃতিক ভারসাম্য এসব বড়ো বড়ো কথা সমানে আউড়ে যাচ্ছে।

শিকার করা ভালো কী খারাপ তা নিয়ে তর্ক চলছিল। আমি আর মিনু শ্রোতা। তার্কিক ওরা তিনজন। ঝল্টু, পিন্টু দুজনে একদিকে। বিপরীতে বিল্টু। হলে কী হয়, দুজনে মিলেও বিল্টুর সঙ্গে যুক্তিতে ঠিক পেরে উঠছিল না। হাজার হোক বিল্টু তো আমারই ভাই। তার ওপর বাইরের বইটই বেশ পড়ে।

কিন্তু এর মধ্যে কুট্টিমামা আবার এসব বলে কী বিপদ বাঁধাল। শিকার নাকি দরকারি। এতক্ষণ তো এর বিরুদ্ধে লড়ে চলেছিল বিল্টু!

আমি অবশ্য শিকারের পক্ষে। তবে মনে মনে। তা বলে সব শিকার নয়। খাবার জন্য যা কিছু শিকার, তার পক্ষে। যেমন ধর খরগোশ। দু-চারটে মেরে খাওয়া কি খারাপ? হরিণের মাংসও খেয়ে দেখেছি। বেশ ভালো। মৎস শিকার করতে কে না ভালোবাসে? আর এই যে পাঠা, ভেড়া সব কাটা হচ্ছে। এও তো একধরনের শিকার! তবে?

তবে, বিল্টু আমার নিজের খুড়তুতো ভাই। 'খুড়তুতো ভাই-এর খুড়তুতো-মামাতো' ভাইদের চেয়ে নিজের 'খুড়তুতো ভাই' নিশ্চয়ই আপন। তাই বিল্টুর ডিফেন্সে আমায় নামতেই হল। বিল্টু বেশ জিতেই যাচ্ছিল। কোত্থেকে হঠাৎ এসে কুট্টিমামা সব গন্ডগোল পাকিয়ে দিল।

"না, না চলে গেলে চলবে না কুট্টিমামা। তোমার কথার ব্যাখ্যা করে যাও। এক্সপ্লেইন উইথ রেফারেন্স টু দি কনটেক্সট্। তুমি বলতে চাইছ শিকার করা যথার্থ?"

"না বৎস। আমি অত্যধিক এবং অনাবশ্যক শিকারের কথা বলেছি। তা খারাপ, তাই বলেছি। বাকি শিকার তো ভালোই। আরে সে জন্যই তো জীবজগতে ভারসাম্য আছে।"

"তার মানে?"

"তাহলে তো বসতেই হয়।" কুট্টিমামা খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল।

"অত্যধিক ও অনাবশ্যক শিকার কারা করে জানিস? মানুষ! হ্যাঁ, মানুষই একমাত্র প্রাণী যে বিনা প্রয়োজনে শিকার করে। অন্য প্রাণীরা হত্যা করে হয় খাদ্যের জন্য, না হয় আত্মরক্ষার জন্য।

"মানুষ এ দুটো ছাড়াও সবচেয়ে বেশি যে কারণে শিকার করে, তা হল তার ক্ষণিক আনন্দের জন্য। ইংরেজিতে শিকার করা এক ধরনের স্পোর্টস—খেলা! বিনা প্রয়োজনে, শুধু খেলার ছলে, আমি যে একটা কেউ কেটা, বাঘ মারতে পারি, সিংহ মারতে পারি, তা দেখাবার জন্যই মানুষ শিকার করে। রাজা, বাদশা, আর উঠতি বড়োলোকদের অবসর বিনোদনের একটা অন্যতম উপায়ই হল শিকার। পরিণতি কী হতে পারে সে সম্বন্ধে উদাসীন। ইংল্যান্ডের বড়োলোকদের একসময় অবসর বিনোদনের একটা উপায়ই ছিল ফক্স হান্টিং। মানে খেঁকশিয়াল শিকার। এই করতে করতে অবস্থা এমন হয়েছে, যে সারা ইংল্যান্ডে আর কোনো শিয়ালই নেই। অথচ শেয়াল থাকা দরকার।"

"সে আবার কী? শেয়াল থাকা দরকার কেন?"

"বাঃ, শেয়ালের মতো এত ভালো ঝাড়ুদার আর কে আছে? কাক, শেয়াল, কুকুর, হায়না, শকুন এসব না থাকলে আবর্জনা পরিষ্কার করবে কে? জঙ্গলে অন্য প্রাণীর মরা মাংসের শেষটুকু মুছে দিতে এদের জুড়ি নেই।

"এরপরেও আছে নানা সংস্কার। মানুষের সমাজের নানা সংস্কারের কারণেও প্রাণী হত্যা হয়। আবার সংস্কারের কারণেই কোনো কোনো প্রাণীর সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি হয়। কেউ গোরু খায় না—সেখানে গোরু মারা বারণ। কেউ শুয়োর খায় না—সেখানে শুয়োর মারা বারণ।

"এসব কারণেই প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। প্রাণী না থাকা—বা অত্যধিক থাকা, দু-কারণেই ভারসাম্য যেতে পারে।"



"মানুষ না মারলে কোনো কোনো প্রাণী সংখ্যায় এত বেড়ে যাবে যে, তাতেও ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে।" ঝন্টু বলে।

"তা যে হয় না, তা নয়। তবে প্রকৃতির একটা অদ্ভুত শৃঙ্খলা আছে। সমগ্র প্রাণীজগতে আছে খাদ্য আর খাদক। শিকার আর শিকারি। হরিণ

ঘাস, লতাপাতা খায়। ফলে ঘাস লতাপাতা বেশি বাড়তে পারে না। আবার হরিণকে বাঘে খায়। ফলে হরিণও বেশি বাড়তে পারে না। বাঘের বংশবৃদ্ধি খুব ধীরে। ফলে বাঘও বাড়ে না। এভাবেই প্রকৃতিতে চলে আসছিল। এর মধ্যে কোথাও কিছু নেই, মানুষ ঢুকে পড়ে সব গোলমাল পাকিয়ে দেয়। ফলে ভারসাম্য নষ্ট হয়। খাদ্য শৃঙ্খলে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়।

"তবে কোথাও কোনো প্রাণী অত্যধিক বেড়ে গেলে মানুষকে হস্তক্ষেপ করতে হবে বইকী। যেমন অস্ট্রেলিয়ায় খরগোশের বেলা করতে হয়েছিল। তবে আশ্চর্য! প্রকৃতিও নিজেই অনেক সময় এর সমাধান করে নেয়।"

"কী হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায় কুট্টিমামা?" ঝন্টুর ভাই পিন্টু জানতে চায়।

"গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কথা। নতুন বসতি করা ইয়োরোপীয়রা সেখানে বড়ো বড়ো খামার বানিয়ে ভেড়ার চাষ করছে। বেশ দু-পয়সা আসছেও তাতে।

"এমনি এক সম্পন্ন ভেড়া চাষি ছিলেন 'টমাস অগাস্টিন'। থাকতেন দক্ষিণ-পূর্বের প্রদেশ 'নিউ সাউথ ওয়েলস'-এ। শুধু ভেড়া পালন নয়। শিকারেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সেবার ইয়োরোপে ছুটি কাটিয়ে ফিরবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এলেন মাত্র দু-ডজন অর্থাৎ চব্বিশটি খরগোশ। আনলেন স্রেফ ভালোবেসে। বড়ো সুন্দর। কী মিষ্টি সব প্রাণী। লম্বা লম্বা কানগুলি খাড়া করে যখন সাদা সাদা খরগোশগুলি বাড়ির উঠোনে আর মাঠে খেলা করে বেড়াত। কী সুন্দর না লাগত সে দৃশ্য! কখনো বা টমাস বা তার বাচ্চাদের হাত থেকে খরগোশেরা এসে বাঁধাকপির পাতা খেয়ে যেত। কখনো-সখনো দু-একটাকে মেরে তার মাংস খাওয়াও হত। কারণ ইতিমধ্যেই তারা বংশবৃদ্ধি শুরু করেছে।



"পাশের খামারটা ছিল রবার্টসনের। ক্রমশ খরগোশের দল তার বাড়িতে, খামারেও হানা দিতে শুরু করল। রবার্টসনেরও বড্ড পছন্দ তাদের। গ্রামের এক ফাজিল ছোকরা রবার্টসনের জমিদারিতে একদিন

একটা খরগোশ মেরে বসল। নির্ঘাত খাবে বলে। রবার্টসন ছাড়বার পাত্র নন। ছোকরাকে ডেকে এনে শুধু ধমক-ঠমক নয়, দস্তুর মতো দশ পাউন্ড জরিমানাও আদায় করে নিলেন। এটা ছিল ১৮৫৯ সালের ঘটনা।

"কিন্তু কাণ্ড দেখো, মাত্র পাঁচ বছর বাদেই, তার মানে ১৮৬৪ সালে ওই রবার্টসনই পাঁচ হাজার পাউন্ড দণ্ড দিলেন।"

"সেকী? কেন?" আমরা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করি।

"না, তাকে কেউ জরিমানা করেনি। নিজেই খরচা করেছিলেন শিকারিদের বেতন দিতে। খরগোশ মারতে এ খরচ। ১৮৬৫ সালে অর্থাৎ পরের বছর সেই টমাস অগাস্টিন তার নিজের খামারেই চব্বিশ হাজার খরগোশ মেরেছিলেন। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন 'শশকবংশ ধ্বংস না করে, জলস্পর্শ করব না।'

"কিন্তু কেন? তার কারণ খরগোশের বংশ বৃদ্ধি। সংখ্যায় তারা এমন বাড়তে লাগল, আর এত ঘাস খেতে লাগল যে, ভেড়ার খাওয়ার জন্য আর ঘাস রইল না বললেই চলে। একটি ভেড়া একদিনে যতটা জমির ঘাস খায়, পাঁচটি খরগোশেও ততটাই খায়। এদিকে ততদিনে খরগোশের সংখ্যা ভেড়ার সংখ্যার পাঁচগুণেরও বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"সে কী কথা! খরগোশ কি এত তাড়াতাড়ি বাড়ে?" ঝন্টুর জিজ্ঞাসা।

"সেটাই তো মজা। ভেড়া বাচ্চা দেয় বছরে একবার বা তারও কম। আর খরগোশ দেয় বছরে পাঁচ-ছয় বার। প্রতিবারে গুটি দশেক করে। বিজ্ঞানের কেরামতিতে এরা হাইব্রিড খরগোশ। মাস ছয়েক বয়স হলেই তারা বাচ্চা দিতে শুরু করে। ভয়াবহ ব্যাপার। সেই দাবার ছকের অঙ্কটা জানিস?"



এটা আমার জানা। জর্জ গ্যামোর বইতে পড়েছি। পড়েছি অন্য ধাঁধার বইতেও। প্রথম দিন প্রথম ঘরে একটি দানা। দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় ঘরে দুটি। পরদিন তৃতীয় ঘরে চারটি। তার পরদিন চতুর্থ ঘরে আটটি ইত্যাদি। দাবার চৌষট্টিটি ঘর। অঙ্ক কষলে বের হবে চৌষট্টি ঘরে দেবার মত গমের জন্য পৃথিবীর কয়েকশো বছরের উৎপাদিত সব গম দিয়েও

কুলোবে না। বললাম, ‘‘জানি জানি। সেই একদানা, দু-দানা, চার দানা, আটদানার অঙ্কটা তো? প্রতিদিন আগের দিনের ডবল।’’

অঙ্ক সম্বন্ধে মিনুর বেশ ভীতি। এখন দেখলাম পিন্টুও অঙ্ক ভয় পায়। দুজনে সমস্বরে বলে উঠল, ‘‘থাক থাক। অঙ্ক থাক। খরগোশের কথা শোনা যাক।’’

‘‘হিসেব কষলে দেখা যাবে, দু-বছরেই একজোড়া খরগোশ থেকে লক্ষাধিক ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি, পুতি-পুতনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। এ জন্মানো নয়—দস্তুর মতো আবির্ভাব।

বিশ বছরে অবস্থা হল সাংঘাতিক। লক্ষ লক্ষ নয়, একেবারে কোটি কোটি। অন্তত কয়েকশো কোটি। আর শুধু ঘাস তো নয়, যা কিছু সবুজ সবই তার খাদ্য। সারা দেশময় খরগোশ। আর তার ফলে দেশটা মরুভূমি হতে বসল। হাজার হাজার মানুষ নেমে পড়ল খরগোশ মারতে। এক ১৯৫০ সালেই আমাদের হিসেবে ছশো চল্লিশ কোটি টাকা খরচ করেছিল সে দেশের সরকার। কেন? না, শুধু খরগোশ মারতে।

‘‘অতই কী সোজা খরগোশ মারা! ‘মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী?’ কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়েছিস তো? এ সেই দশা। তখন আমদানি করা হল শেয়াল। অস্ট্রেলিয়ায় এর আগে শেয়াল ছিল না। সবাই মনে করল, এবার নিশ্চয় খরগোশ মরবে। তার স্বভাবশত্রু শেয়াল। খরগোশ শেষ করতে তার বেশি সময় লাগবে না।

‘‘কিন্তু শেয়ালগুলোও বিশ্বাসঘাতক। ওদেশে তারা গিয়ে দেখল, এ তো বেশ মজা! আরও বহু জীবজন্তু আছে, যাদের পেছনে ধাওয়াই করতে হয় না। বিনা পরিশ্রমে মারা যায়। সুতরাং কে আর কষ্ট করে খরগোশ ধরতে ছোটে। তারা খরগোশের দিকে মুখ ফিরিয়েও দেখল না। বরং অন্য সব প্রাণী, যাদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার জীববৈচিত্র্য রাখার জন্য, তারা দলকে দল শেষ হতে চলল।’’



‘‘এ তো সাংঘাতিক কাণ্ড গো কুট্টিমামা। তার মানে এখনও অস্ট্রেলিয়ায় অত খরগোশ? আর তারা সব গাছপালা খেয়ে চলেছে?’’ মিনু জানতে চায়।



"শেষ পর্যন্ত শোন না। এবার সরকার ঠিক করল, শেয়ালে যখন হল না, দেওয়ালে তখন চেষ্টা করা যাক। তার মানে খরগোশদের তাড়িয়ে দিয়ে দেওয়াল তুলে দেওয়া হল, খেত ঘিরে। প্রথমবারে দু-হাজার কিলোমিটার দেওয়াল দেওয়া হল, পরে আরও সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার।"

"এবারে নিশ্চয়ই খরগোশেরা জব্দ!"

"অত সোজা? খরগোশ গর্ত খুঁড়তে পারে এটা কী করে তারা ভুলে গেলেন কে জানে। সোজা ওপার থেকে গর্ত করে দেওয়ালের তলা দিয়ে দলে দলে এপারে এসে বুলবুলির মত ধান খেয়ে গেলেই হল!"

"তাহলে মানুষ শেষ পর্যন্ত খরগোশের কাছে হেরে গেল?"

"মানুষ কি অত সহজে হার মানে? এবার বিজ্ঞানীদের ডাক পড়ল। তাঁরা খুজতে বসলেন পৃথিবীর কোন দেশে কীভাবে খরগোশদের জব্দ করা হয়েছিল। অবশেষে তাঁরা জানালেন, হ্যাঁ একবার শশক বংশ ধ্বংস হয়েছিল বটে! এ সত্যিকারের ঐতিহাসিক তথ্য। ১৮৯৬ সালে 'মিক্সোম্যাটোসিস' ভাইরাসের আক্রমণে উরুগুয়েতে লক্ষ লক্ষ খরগোশ শেষ হয়েছিল।

"তবে অমন সাংঘাতিক ভাইরাস তো বললেই প্রয়োগ করা যায় না। মানুষের ওপর, অন্যান্য প্রাণী, গাছপালার ওপর তার কী প্রভাব তাও তো দেখা দরকার। সুতরাং বেশ কিছুদিন ধরে চলল নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আর কারো কোনো ক্ষতি হবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে, বৈজ্ঞানিকরা কটি খরগোশ ধরে এনে 'মিক্সোম্যাটোসিস' ভাইরাস ইঞ্জেক্‌শান দিয়ে তাদের ছেড়ে দিলেন। এবার মাত্র কয়েক মাস অপেক্ষা।"

"যাক খরগোশ বংশ ধ্বংস!" আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।



"না গো দিদিমণি। অত সোজা নয়।" মিনুর স্বস্তির জবাব দেয় কুট্টিমামা। "তবে কমল। ছিল চারশো কোটি, ক'মাসের মধ্যে দলে দলে মরে গিয়ে তারা দাঁড়াল পঞ্চাশ কোটিতে। কিন্তু আর মরে না। বৈজ্ঞানিকরা চিন্তায় পড়লেন।"

"সে আবার কী? সবাই মরল না কেন?"

"বাকি খরগোশরা মিক্সোম্যাটোসিস ভাইরাসে অনাক্রম্য মানে immuned হয়ে গেল। সব জীবাণুর বেলাতেই তাই হয়।"

"এরকম হয় নাকি? তাহলে তো খুব মুশকিল!"

"হয়। অবশ্য একারণেই আবার আমাদের উপকারও হয়। প্রাণীর দেহে এই প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায় বলেই, বিভিন্ন রোগের ভ্যাক্সিনও দেওয়া সম্ভব হয়। যাকগে, সে অন্য কথা। এবার আবার খোঁজা শুরু হল নতুন ধরনের ভাইরাসের। পাওয়াও গেল। তবে এরা মশকবাহিত। তার মানে, সোজাসুজি এদের খরগোশের শরীরে ভরে দিলে হবে না। এদের জীবনবৃত্তের একটা অংশ কাটে মশার শরীরে। ম্যালেরিয়ার জীবাণুর মতো। সুতরাং এই নতুন ভাইরাসদের ধরে মশার পেটে ইঞ্জেক্শন দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। তারপর সেই মশাদের ছেড়ে দেওয়া হল খরগোশদের আস্তানায়। এবার আবার শশক-মড়ক। এক ধাক্কায় পঞ্চাশ কোটি দাড়াল পাঁচ কোটিতে।

"কিন্তু সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বাকিরা আবার নতুন ভাইরাসে অনাক্রম্য হয়ে দাঁড়াল। ১৯৯৫-এর হিসেবে তাদের সংখ্যা আবার বেড়ে হয়েছে বিশ কোটি।"

"তাহলে খরগোশ কি শেষ করা যাবে না অস্ট্রেলিয়ায়?" ঝন্টু জিজ্ঞাসা করে।

"মানুষ অত সহজে হারবার পাত্র নয়। আবার চলল নতুন অস্ত্রের খোঁজ। পাশুপত কি বরুণাস্ত্র। নিদেনপক্ষে অগ্নিবাণ। শেষ পর্যন্ত বোধ হয় কোনো বাণের আর দরকার হল না। বলেছিলাম না, প্রকৃতিদেবীই তার নিজের কাজ করে নেয়।

"অস্ট্রেলিয়ার একদল বৈজ্ঞানিক 'র‍্যাবিট ক্যাল্সিভাইরাস' নামে এক নতুন ধরনের ভাইরাস নিয়ে মূল মহাদেশ থেকে তিন মাইল দূরে সমুদ্রের ভেতরে এক নির্জন দ্বীপে কাজ করছিলেন ১৯৯৫-এর অক্টোবরে। এর আগে এ ভাইরাস ইয়োরোপে আর চীনে খরগোশ ধ্বংসে খুব কাজ দিয়েছিল। কেমনভাবে যেন পোকামাকড়ের পেটে সে ভাইরাস এসে

হাজির হল অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ডে। এ বড়ো সাংঘাতিক ভাইরাস। খরগোশের শরীরে এ ভাইরাস প্রবেশ করলে দু-দিনের মধ্যেই শরীরের রক্তবহানালিতে রক্ত জমাট বেঁধে মৃত্যু অবধারিত। ১৯৯৬ সালের জুন মাসের মধ্যে আক্রান্ত অঞ্চলের শতকরা আটানব্বই ভাগ খরগোশ শেষ।”

“এবার তাহলে কেল্লাফতে? বাকি খরগোশও নিশ্চয় শেষ হয়ে গেছে এতদিনে?” বিল্টু জানতে চায়।

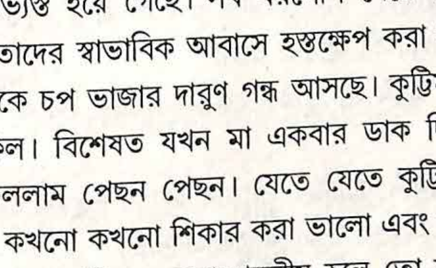
“ধীরে, রজনী ধীরে। বাকি অঞ্চলে এ ভাইরাস ছড়িয়ে দেবার আগে বৈজ্ঞানিকরা ভাবতে বসলেন।”

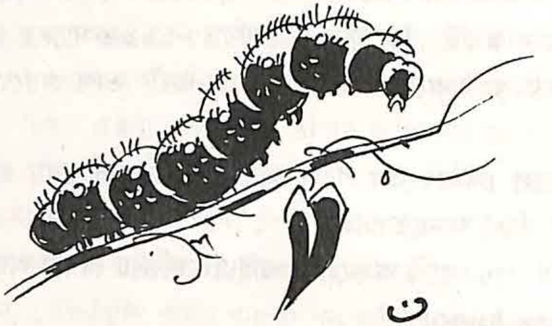
“এত ভাববার কী আছে। অনিষ্টকারী প্রাণীকে মেরে ফেলাই তো দরকার।” ঝন্টু-পিন্টুর সাফ কথা।

“দীর্ঘ দেড়শো বছরেরও বেশি সময় ধরে সে দেশে খরগোশরা আছে। বহু শিকারি পাখি, বন্য কুকুর ডিঙ্গো ইত্যাদি জানোয়ার খরগোশ ধরে খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সব খরগোশ মেরে ফেললে তারা যাবে কোথায়? তাদের স্বাভাবিক আবাসে হস্তক্ষেপ করা হবে না?”

রান্নাঘর থেকে চপ ভাজার দারুণ গন্ধ আসছে। কুট্টিমামাকে এখন আটকানো মুশকিল। বিশেষত যখন মা একবার ডাক দিয়ে গেছেন। আমিও অবশ্য চললাম পেছন পেছন। যেতে যেতে কুট্টিমামা বললে, “তাই বলছিলাম কখনো কখনো শিকার করা ভালো এবং দরকারি। তা বলে সবসময় নয়। অত্যধিক ও অপ্রয়োজনীয় হলে তো নয়ই।”

এক নিশ্বাসেই বলল, “বাকিটা মাংসের চপগুলির সদ্ব্যবহারের পরে। এই বোঁচন, তুই আবার আসছিস কেন? তোকে তো ডাকেনি। পেটুক কোথাকার!”





শুঁয়োপোকা ও মাংসের চপ

"দেখো না ছোড়দি, তুমি আমায় ডাকলে আর বোঁচনটা ঠিক পেছন পেছন চলে এল। কী হ্যাংলা বলো?"

"হ্যাংলা আমি না তুমি? কেমন ওবাড়ি থেকে গন্ধ পেয়ে চলে এসেছ।"

"আমি এমনি এসেছি? ছোড়দি আমায় দস্তুরমতো ফোনে নেমন্তন্ন করেছে। তাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি।"

"থাক থাক, আর মামা-ভাগনেতে লড়াই করতে হবে না। সবার জন্যই করেছি। যা তো বোঁচন, এগুলো ওঘরে নিয়ে যা। সবাই মিলে খাবি।"

"ছোড়দি, তোমার কি একেবারে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে? বোঁচনের হাত দিয়ে পাঠালে, ওর একটাও ওঘরে পৌঁছোবে? তার অনেক আগেই চপগুলো চুপ হয়ে যাবে না?"



"কুট্টিমামা, ভালো হবে না বলছি। আমি মোটেই তোমার মতো নই। আমাদের জন্য রাখা পিঠে কে সরিয়েছিল শুনি? মাকে তো সে গল্প বলাই হয়নি।"

"ওগুলো রেখেছিল চমৎকারিণী। আমি নই।"

"ও, তোমার বেড়াল পলিথিন প্যাকেট জোগাড় করে, দিদার ফ্রিজ খুলে পিঠে নিয়ে প্যাকেটে ভরে রেখেছিল? আবার টিফিন বাকসোটা গুছিয়ে তুলেও রেখেছিল?"

"রেখেছিল তো বটেই। চমৎকারিণী কত কাজ পারে তা জানিস? ও আমার মায়ের জন্য বাজার থেকে পান পর্যন্ত এনে দেয়।"

আমাদের দেরি দেখে বিল্টুরাও পেছন পেছন চলে এসেছে রান্না-ঘরে। এবার বিল্টু তার বড়দার পক্ষ নেয়, "ও কুট্টিমামা, চমৎকারিণী তোমাদের বাজার করে না?"

"করেই তো। জানিস, সেদিন মাছ এনেছিল?"

"সে তো চুরি করে। পাশের বাড়ির কাকিমা বলছিল, চমৎকারিণীর জ্বালায় ঘরে মাছ রাখার জো নেই।"

"বাঃ বেড়াল মাছ পেলে খাবে না? বেড়াল তবে বাঁচবে কী করে? তোমরা ঘরে ইঁদুরও রাখবে না, মাছও দেবে না। তা বিড়াল খাবে কী শুনি? তোমরা মাছ আনবে, চমৎকারিণী খাবে। জগতের তাই নিয়ম। বঙ্কিমচন্দ্র পড়িসনি?"

"পড়ব না কেন? তবে বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা বলেননি, যে পৃথিবীতে সবাই সবাইকে হত্যা করবে। ধরে খাবে।"

"সবাই সবাইকে তো বলিনি। বলেছি, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রাকৃতিক নিয়মই এই। হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিভিন্ন বর্গের, গণের, গোত্রের আর প্রজাতির গাছপালা, কীটপতঙ্গ, স্তন্যপায়ী সবাই যে যার জায়গা খুঁজে নিয়েছে। তার যেমন বংশবৃদ্ধি হয়, তেমনি তার প্রাকৃতিক শত্রুও থাকে। শিকার আর শিকারির খেলা। 'খ'-এর খাদ্য 'ক'। কিন্তু খেয়ে সে 'ক' কে নির্বংশ করে না। আবার অত্যধিক বাড়তেও দেয় না। 'গ' আবার 'খ' কে খেয়ে ফেলে। সে ও 'খ' কে নির্বংশ করে না। কিন্তু অত্যধিক বাড়তেও দেয় না।



"আবার হয়তো দেখা যাবে 'গ'-এর পাঁচ বছর অন্তর দুটি-একটি সন্তান হয়। তাই তারও বংশ বাড়ে না। বাঘের যদি ছাগলের মতো বছরে

 বছরে ছ-আটটি বাচ্চা হত, তাহলে দক্ষিণরায় কি আমাদের কাউকেও আস্ত রাখত? এভাবেই প্রকৃতির ভারসাম্য থাকে। এর মধ্যে অনাবশ্যক ও অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করলে সর্বনাশ তো হবেই। অস্ট্রেলিয়ার পরিস্থিতিতে টমাস অগাস্টিনের খরগোশ নিয়ে যাওয়া এই মারাত্মক ভুল।

"একই ধরনের ভুল করেছেন মধ্যযুগের সমুদ্রযাত্রীরা, বিশেষ করে নানা দ্বীপে ছাগল আমদানি করে।"

"তার মানে, এসব দ্বীপে আগে ছাগল ছিল না? এমন দেশ আছে নাকি?" আমার জিজ্ঞাসা।

"নিশ্চয়। বহু দ্বীপ এবং দেশ ছিল, যেখানে তোর এই বন্ধুরা ছিল না।"

"কুট্টিমামা, ভালো হবে না বলছি—আমার বন্ধুরা ছাগল?"

"তোকে তো বলিনি। তোর বন্ধুদেরও বলিনি। বলেছি ওরা তোর বন্ধু।"

"ওই একই হল।"

ঝন্টু দেখি অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, "কুট্টিমামা, আপনি কিন্তু যা বলছিলেন, তা শেষ করেননি। ছাগল আমদানি করে সমুদ্রযাত্রীরা কী ভুল করেছিল?"

"ছাগল যেখানে থাকে সেখানে গাছপালা, ঘাস, লতাপাতা সব নিঃশেষ করে দেয়। পৃথিবীর বহু দ্বীপ এই করে মরুপ্রায় হয়ে গেছে। আর, এসবই হল অবিমৃষ্যকারীতার ফল। আবার সবসময় যে এ ধরনের বোকামো মানুষ জ্ঞানত করে, তাও নয়। কখনো সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত কারণেও ক্ষতি হয়েছে। যেমন আমেরিকার মেডফোর্ডে জিপসি মথ নিয়ে হয়েছিল।"

"জিপসি মথ আবার কী?"



"কী হয়েছিল মেডফোর্ডে?"

আমাদের কৌতুহল অদম্য। মা-র বোধ হয় অসুবিধে হচ্ছিল। বললেন, "যা তো তোরা এখান থেকে। চপগুলো নিয়ে তোদের ঘরে গিয়েই কুট্টিমামার সঙ্গে গল্প করগে।"

যেতে যেতে কুট্টিমামা বলে, "মথ কাকে বলে জানিস না? প্রজাপতি জাতীয় পতঙ্গ। নিশাচর। এদের প্রথম অবস্থায় হয় শূককীট যাকে আমরা শুঁয়োপোকা বলে জানি।"

বিল্টু চপের সঙ্গে মুড়িও জুটিয়ে এনেছে। তার সদ্‌বহার চলতে লাগল। কুট্টিমামা কী করে যে একই সঙ্গে দু-ভাবে মুখের ব্যবহার করতে পারে, তা কে জানে? মুড়ি, চপ আর বক্তৃতা একই সঙ্গে। এ দেখা যায় না!

"সেটা ১৮৬৯ সালের কথা। তারিখটা ছিল আটই মার্চ। স্থান মার্কিন দেশের ম্যাসাচুসেট্‌স-এর মেডফোর্ড শহর।"

"তুমিও সেদিন সেখানে হাজির, তাই না কুট্টিমামা? যেমন ছিলে সিনসিন্নাতি চিড়িয়াখানায়, মার্থার মৃত্যুর সময়?"

"বিল্টু ফাজলামি করলে বলব না কিন্তু!"

ঝন্টু-পিন্টু ঝাঁপিয়ে পড়ল। "বিল্টু তুই চুপ করবি? না, কুট্টিমামা আপনি বলুন। আমরা শুনছি।"

"এ নাটকের যিনি নায়ক বা বলতে গেলে খলনায়ক, তাঁর নাম লিওপোল্ড ত্রুভেলো। ছিলেন নাম করা জ্যোতির্বিজ্ঞানী। পছন্দ হল না জ্যোতির্বিজ্ঞানীর চাকরি। ছেড়ে দিয়ে মেডফোর্ডে বাসা বাঁধলেন উন্নত জাতের রেশমের গুটিপোকা বানাতে। নিজের গবেষণাগারে তারই পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। সেই পরীক্ষার জন্যই ইয়োরোপ থেকে আমদানি করেছিলেন এই জিপসি মথগুলি। আর তার কটি মূককীট আর শূককীট। খুব সাবধানী মানুষ। কারো কোনো ক্ষতি করা, অসুবিধে করার মধ্যে কোনোদিন নেই। কেউ তা বলতেও পারতেন না। প্রতিবেশীরা তাঁকে নিরীহ নির্বিরোধী এক আধপাগলা বৈজ্ঞানিক বলেই জানত।

"কিন্তু কী যে হল! এমন একটা দিন এল যখন শুধু মেডফোর্ড কেন, আশেপাশের দশ-বিশটা শহরের মানুষও তাকে গালি না দিয়ে জলস্পর্শ করত না। কী বা এমন অপরাধ মানুষটার? শুধু পরীক্ষা চালাতে চালাতে হাত থেকে ফসকে গিয়েছিল কাঁচের বাকসোটা। আর ওই ভাঙা বাকসো থেকে উধাও মথগুলি। সেগুলোর পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে মূক-শূকগুলোও গেল কোথায় পালিয়ে।



"এ আর এমন কী অপরাধ? এ ঘটনার পর বিশ বছর পর্যন্ত তা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায়নি। কাউকে কিছ না বললেও কিছু যেত আসত না। তবে বৈজ্ঞানিক মানুষ তো! তার ওপর যথেষ্ট সাবধানীও। জিপসি মথগুলি হারিয়ে যাওয়ার কথা পরদিনই লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন সেখানকার কৃষি দপ্তরে। তাঁরাও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। চারধারে সবাই খোঁজাখুজি করলেন। আশেপাশের সব গাছপালা ছাত্ররাও দল বেঁধে খুঁজে বেড়াল। নাঃ, কোনো চিহ্নই নেই মথ বা তার পোকাদের। তবু, সাবধানের মার নেই। আশেপাশের সব গাছপালা পুড়িয়ে ফেলা হল। এবার সবাই নিশ্চিন্ত ওদের নিশ্চয়ই এতদিনে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু তাই কি হল?

"এরপর কেটে গেল কুড়িটা বছর। সবাই ভুলেই গেছে জিপসি মথের কথা। হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষও নয়, কোটি কোটি শুঁয়োপোকা। সারা মেড্‌ফোর্ড, তার আশেপাশের সমস্ত শহরে শুধু শুঁয়োপোকা। সকালে উঠে মানুষ দেখল উঠোনে শূঁয়োপোকা। ঘরের ভেতরে শুঁয়োপোকা। বিছানায়, বালিশে, বাথরুমে, খাবার টেবিলে কোথায় না শুঁয়োপোকা? রান্নার তরকারিতে, জলের বালতিতে সবখানে এক অবস্থা।

"যার হাতের কাছে যা পেল, তাই নিয়ে পোকা মারতে শুরু করে দিল। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বাচ্চা, সবাই শুধু শুঁয়োপোকা মেরে চলেছে। কোদাল, বেলচা, লাঠিসোটা, হাতা, খুন্তি যে যা পারে তাই দিয়ে রাত্রিদিন পোকা মেরে চলেছে। পুরসভার রোড-রোলার রাস্তায় শুঁয়োপোকা চাপা দিয়ে মেরে চলেছে। সারা রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে পড়েছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য!

"চারদিকে পোকা মরে পচে গলে ভয়ংকর দুর্গন্ধ। মানুষ পাগলের মতো হয়ে উঠেছে। কী যে করবে, ভেবেই পাচ্ছে না।



"১৯০১ সালে চার হাজার বর্গমাইল জুড়ে শুঁয়োপোকা। ১৯০৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল দশ হাজার বর্গমাইল।

"অবশ্য শেষ পর্যন্ত মানুষ জয়ী হল। দমন করা গেল তাদের। কিন্তু

ততদিনে কত যে ক্ষতি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। শুধু এদের দমন করতেই তখনকার দিনে সরকারের খরচ হয়ে গেল বিশ লক্ষ ডলার। আজকের হিসেবে নিদেনপক্ষে বিশ কোটি ডলার। অর্থাৎ প্রায় হাজার কোটি টাকা।"

এতক্ষণ আমরা শুনে চলেছিলাম কুট্টিমামার কথা। বেশ খানিকক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই। অবশেষে বিল্টু মুখ খোলে, "তাহলে ভাবো, একটা মানুষের জন্য কী সাংঘাতিক কাণ্ড।"

"তবেই বোঝো। ভালো করব বললেই করা যায় না। ত্রুভেলো তো উপকার করবেন বলেই জিপসি মথ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর সামান্য ত্রুটিতে, কী কাণ্ড হল। কত ক্ষতি!

"আচ্ছা বোঁচন, মাংসের চপগুলোতে কেমন শুঁয়োপোকা শুঁয়োপোকা গন্ধ পেলি না?" আমার দিকে চোখ টিপে কথাটা বললে কুট্টিমামা।

তাৎপর্যটা বুঝে নিয়ে আমি সায় দিই, "হ্যাঁ, ঠিকই তো। কীরকম একটা দুর্গন্ধ যেন নাকে লাগছে। তখনই মাকে বলছিলাম।"

"অ্যা মা!" মিনুটা হাতের চপটা চট করে প্লেটে নামিয়ে রাখে। "ভালো হবে না বলছি কুট্টিমামা, ঘেন্না দিয়ো না বলছি।"

"ঘেন্না দিলাম কোথায়? আমার মনে হল, তাই বললাম, কেমন যেন শুঁয়োপোকার গন্ধ। দু-চারদিনের পচা বলেই তো বোধ হচ্ছে।"

বেশি বলতে হল না। বিল্টু-পিন্টু-ঝন্টু সবাই হাত গুটিয়ে নিয়েছে। এই ফাঁকে আমি দুটো দু-হাতে তুলে নিলাম। কুট্টিমামা কমপক্ষে গোটা পাঁচেক।





বাইসন-নিধন

অবাক কাণ্ড! ঝন্টু-পিন্টু দেখি আমাদের চেয়েও বেশি কুট্টিমামার ভক্ত হয়ে পড়েছে। সকাল থেকে জ্বালাচ্ছে। “ও বোঁচনদা, ও বাড়ি চলো না! কুট্টিমামা কী যেন দেখাবেন বলেছিলেন।”

যত বলি, “দাঁড়া, আমার প্র্যাকটিকাল খাতা তৈরি বাকি। এটা না সেরে কোথাও যেতে পারব না।” তা কে শোনে কার কথা?

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই বিল্টু-মিনুকে ডেকে নিয়ে যেতে হল ও বাড়ি। ওরা অবশ্য সকালের পড়া শেষ করে তখন লুডো নিয়ে বসেছিল। আমি কলেজে পড়ি তো! তাই আমার পড়ার চাপ একটু বেশি।

কুট্টিমামা দেখি এক ট্রে ভরতি হাড়গোড় নিয়ে বসেছে। কোনোটা তুলে চোখের কাছে নিয়ে দেখছে। চোখে আবার ঘড়িওয়ালাদের মতো চোঙাওয়ালা আতশ কাঁচ লাগিয়েছে। কখনো বা সেটা খুলে রেখে একটা হাতলওয়ালা আতশ কাঁচ দিয়ে দেখছে। একটা করে দেখছে, আর অন্য একটা ট্রেতে রাখছে।



আমরা ভেতরে ঢুকতেই বলল, “বোস, প্রায় শেষ করে এনেছি। হয়ে এল বলে।”

“এগুলো কীসের হাড় কুট্টিমামা? ছাগলের?” বিল্টু জানতে চায়।

“ছাগলের হাড় এরকম হয়?”

“তা তো জানি না। তোমার কাছেই তো জানতে চাইছি।”

“এগুলো অরোখ্স আর ম্যামথের।”

“ম্যামথ তো জানি। অরোখ্সটা কী?” ঝন্টু জিজ্ঞাসা করে।

“জানিস না? অরোখ্স হলো গোরুর পূর্বপুরুষ। আজকের গোরু, মোষ, বাইসন, মিথুন, গৌর এদের সকলের আবির্ভাব এই অরোখ্স থেকে।

“দেখো কুট্টিমামা গুল মেরো না। ম্যামথ পৃথিবী থেকে চলে গেছে অন্তত হাজার দশেক বছর আগে। আর ওই অরোখ্স না কী বললে, তাও কয়েক হাজার বছর আগেকার কথা নিশ্চয়ই। তুমি বলতে চাও এসব তাদের হাড়?”

“একটু ভুল হল বৎস। পৃথিবীর শেষতম অরোখ্স, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যার নাম ‘বস তরাস প্রাইমিজিনাস’ (Bos Taurus Primigenus) দেখা গেছে ১৬২৭ সালে পোল্যান্ডের ‘ইয়াক্‌-তোজোওকা’ জঙ্গলে। রাজধানী ওয়ারশ আর গ্রোদ্‌নো শহরের মাঝে এই জঙ্গল। তখন সে জঙ্গলের মালিক ছিলেন কাউন্ট মাজোভিয়েকি।”

“সেই অরোখ্স-এর হাড় আপনার কাছে? আর এই ম্যামথ এর হাড়? দশ হাজারেরও বেশি পুরোনো হাড় এল কোত্থেকে?” পিন্টুর অবাক হবারই কথা।

“একি আপনি কুড়িয়ে পেয়েছেন?” তার দাদাও অবাক।

“না না, তা কেন। এ পাঠিয়েছে আমাকে। পরীক্ষা করার জন্য।”

বিল্টুটার ফাজলামো যায় না। “তবে কি আমেরিকার হার্ভার্ড কি বার্কলে থেকে তোমার মতামত চেয়ে পাঠিয়েছে?”

“না বৎস। এটা পাঠিয়েছেন এক কৃষক—চাষি। তাঁর নাম ‘জোসেফ ক্রোমেচেক’। নিবাস বর্তমান চেক রিপাব্লিকের ‘প্রিড্‌মোস্টে’। বিশ্বাস না হয় এটি দেখো।” বলেই কুট্টিমামা ম্যাজিশিয়ানের মতো টেবিলের তলা থেকে একটা বাকসের ঢাকনা বের করে ফেলল। আর তাতে সত্যিই



লেখা কুট্টিমামার নাম। প্রেরকের নাম ঠিকানাও ঠিক। অবাক কাণ্ড! কুট্টিমামার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এক লাফে অনেকটাই বেড়ে গেল।

এবার আমাদের সকলে মিলে বিল্টুকে বকবার পালা। তার মুখটা শুকিয়ে গেছে। একেবারে অপ্রস্তুত। ঝন্টু-পিন্টু একটু বেশি ধমকাচ্ছিল।

"থাক থাক। না জেনে কী বলতে কী বলেছে। ওর কথা ধরলে চলে?"

"না কুট্টিমামা। আপনি বলুন। ওই চাষি আপনার কাছে এ হাড় পাঠাল কেন?"

"পাঠাবে না? ওর জমির নীচেই যে এসব হাড় পাওয়া গেছে। দীর্ঘ দিন ধরেই পাওয়া যাচ্ছে।"

"হাড় তো পাওয়া যেতেই পারে। ওখানে হয়তো ভাগাড় ছিল। সব মরা জন্তুজানোয়ার এনে ফেলা হত।" আমি মত দিই।

"যে-সে হাড় নয়। এর বেশির ভাগ প্রাণীই আজ আর পৃথিবীতে নেই। যেমন অরোখ্স, লোমশ ম্যামথ, বুনো ঘোড়া, বাইসন, বল্গা হরিণ কী নেই? পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এদের কারো কারো বয়স নিদেনপক্ষে বিশ হাজার বছর। শুধু তাই নয়। এদের হাড়গুলোতে মানুষের দাঁতের চিহ্নও আছে। অর্থাৎ এদের মেরে মাংস খেয়ে, মানুষ তার হাড়ও চিবিয়েছে।

"বিশ হাজার বছর আগে মানুষের অবলম্বন ছিল পাথরের সব অস্ত্র। তাই দিয়েই মানুষ এসব প্রাণী হত্যা করেছে। আর তা খাদ্যের জন্যই।"

"কেন? তখন ছাগল ভেড়া মুরগি পুষত না মানুষ?"

"না, সেসব অনেক পরের ঘটনা। তখন মানুষের একমাত্র সঙ্গী ছিল কুকুর। আর কেউ নয়।"

"মানুষকে একা দোষ দিচ্ছ কেন? অন্য প্রাণীরাও তো জীব হত্যা করে। তুমিই বলেছ, তা করে খাদ্যের জন্যই।" আমি বলতে বাধ্য হই।



"নিশ্চয়ই করে। করে বলেই পৃথিবীতে জীবজন্তু টিকে আছে।"

"এ আবার কী অদ্ভুত কথা। জীব হত্যা করলেই তারা টিকে থাকে?"

"ঠিকই। প্রকৃতি এভাবেই ভারসাম্য বজায় রাখে। তাহলে তোদের একটা ঘটনার কথা বলতে হয়।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি বলুন। আমরা শুনি।"

"আমেরিকার আরিজোনা রাজ্যের কাইবার উপত্যকা। একসময় সেখানে ছিল অসংখ্য হরিণ। কিন্তু হরিণ বুঝি আর থাকে না। কারণ পুমা আর নেকড়ে। পুমা আর নেকড়ের জ্বালায় হরিণের বংশ রাখাই দায়। তারা সুযোগ পেলেই হরিণ মারে। এত সুন্দর সে হরিণগুলি, দেখলেই কেমন মায়া হয়। অথচ পুমা আর নেকড়েরা নির্দয়।

"মানুষের মন তো! হরিণের দুঃখে সেখানকার অধিবাসীরা ঠিক করল, এই হিংস্র পশুগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা দরকার। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। শিকারিরা সবাই মিলে উঠে পড়ে লাগল পুমা, নেকড়ের বংশ ধ্বংস করতে। সবাই মিলে কাজে লাগলে, কদিনই বা! ঝাড়েবংশে শেষ করে দেওয়া হল এইসব শিকারি পশুদের। এরপর হরিণের বংশ বেড়েই চলল। স্থানীয় অধিবাসীদের আনন্দ আর ধরে না।

"কিন্তু নাঃ! এ কী? বাড়ছে না তো আর? বরং ক্রমশ কমছে। প্রথমে ধীরে ধীরে। পরে দ্রুত গতিতে। হরিণ বংশ উজাড় হতে চলল।

"সবাই পড়ল দুশ্চিন্তায়। ভেবেচিন্তে কুল পাওয়া যাচ্ছে না। তখন ডাকা হল পণ্ডিতদের যাঁরা এসব বিষয়ে অনেক জানেন।

"তারা এসে বললেন 'করেছেন কী মশাই? সর্বনাশ করেছেন যে। শিকারি প্রাণীই নেই—তাহলে হরিণের বংশ থাকবে কী করে?'

"সবাই অবাক! আমাদের বোঁচনের মতো। শিকারিরা না থাকলেই তো মনের আনন্দে হরিণের সংখ্যা বাড়ার কথা। তাদের অনুপস্থিতিতে হরিণের সংখ্যা কমবে কেন?

"তখন পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করে বোঝালেন ঃ শিকারি প্রাণীরা কী করে? তারা শিকার ধরে। তাই শিকার অর্থাৎ এখানে হরিণ প্রাণভয়ে ছোটে। পেছনে তাড়া করে শিকারি নেকড়ে আর পুমারা। সারা দিনরাত এভাবে ছুটতে হয় বলে হরিণের শরীর থাকত সতেজ সবল। কিন্তু বসে বসে খেলে কী হয়?"



"বড়দার মতো নাদুসনুদুস হয়।" বিল্টুর সবটাতে ইয়ারকি।

"হ্যাঁ। হরিণদেরও প্রাণভয়ে আর ছুটতে হয় না বলে ব্যায়াম হয় না।

অমন শরীরে রোগ ধরলে মৃত্যু অবধারিত। অন্যদিকে শিকারি প্রাণীদের হাতে মারা পড়ে কারা? সবচেয়ে যারা দুর্বল, কিংবা যারা অসুস্থ তারা। পুমা আর নেকড়ে থাকায় এই অসুস্থ, বা রোগগ্রস্ত হরিণেরা মারা পড়ত। এখন তারা দলেই থাকে। আর অন্য হরিণদের মধ্যে রোগ ছড়ায়। ফলে দলে দলে হরিণ মারা পড়ে।

"অন্যদিকে আরও একটা ঘটনা ঘটে চলল। সংখ্যায় বাড়াতে হরিণদের স্বাভাবিক খাদ্যে টান পড়ল। তারা দল বেঁধে আশেপাশের গ্রামে চাষের খেতে হানা দিতে শুরু করল শস্য খাবার লোভে। চাষিদের কাছে ওসব প্রকৃতিপ্রেমের চেয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়াল খেতের ফসল বাঁচানো। তারাও সুযোগ পেলেই হরিণ মারতে শুরু করে দিল। ফলে শিকারি প্রাণী একেবারে মেরে ফেলে, লাভের চেয়ে লোকসান হল অনেক বেশি। হরিণের সংখ্যা বাড়বার বদলে কমেই গেল।"

"এদিকটা তো আমরা কখনো ভাবিনি।" ঝন্টুর স্বীকারোক্তি শোনা গেল।

"তোরা কেন? তাবড় তারও পণ্ডিতরাই ভাবেননি। এরকম বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটবার পরেই না সবার খেয়াল হল!"

"তার মানে এধরনের ব্যাপার আরও আছে?"

"অনেক অনেক। মানুষ কি সহজে শেখে? রাশিয়ার তাইগা অঞ্চলে আর কানাডায় বল্গা হরিণদের বেলা ঠিক এমনটাই হয়েছিল।"

"কী হয়েছিল সেখানে, বলো না কুট্টিমামা।" মিনু আবদার করে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি বলুন কুট্টিমামা।"

"কানাডার কথাই বলি। তোরা তো ভূগোল পড়েছিস। নিশ্চয়ই জানিস কানাডার উত্তর ভাগ প্রায় সারাবছর, প্রায় কেন, সারাবছরই বরফে ঢাকা থাকে। এই তুষারাবৃত অঞ্চলে এক ধরনের বল্গা হরিণ দেখা যায়। এখন এরা প্রায় দুষ্প্রাপ্য। এদের নাম 'ক্যারিবু'। এই ক্যারিবু বল্গা হরিণদের সংখ্যা গোনা হয়েছিল ১৯১১ সালে। হিসেব কষে দেখা হয়েছিল, সেসময় তাদের সংখ্যা ছিল অন্তত তিন কোটি।



"কিন্তু এই ক্যারিবুদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু ছিল নেকড়ে বাঘ।

তুষারাবৃত অঞ্চলে আর কী পাবে? তাই নেকড়েদের কাছে ক্যারিবুর মাংসই ছিল একমাত্র খাদ্য। ফলে ক্যারিবুদের সংখ্যা কমতেই লাগল। মাত্র পঁচিশ বছরে, তার মানে ১৯৩৬ সালে ক্যারিবুর সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র পঁচিশ লক্ষে। এর পরের বারো বছরেই সংখ্যা কমে দাঁড়াল মাত্র পাঁচ লক্ষ। ১৯৫৬তে তারও অর্ধেক। তার মানে ১৯১১ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরে ক্যারিবুর সংখ্যা কমে হয়েছে একশো কুড়ি ভাগের এক ভাগ। এতদিনে ঘুম ভাঙল প্রকৃতি-প্রেমীদের। নেকড়ে বাঘই যখন কারণ, তখন মারো তাদের।

"উচিত ছিল ভারসাম্য বজায় রাখতে যত নেকড়ে মারা দরকার, ততটাই মারা। তা নয়। চলল নির্বিচারে হত্যা। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৮-র মধ্যে হত্যা করা হল অন্তত সাড়ে ছয় হাজার নেকড়ে।

"১৯৫৮-৫৯ সালে দেখা গেল ক্যারিবুদের বংশ দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে। সবাই আনন্দে উৎফুল্ল। যাক এতদিনে একটা কাজের মতো কাজ করা গেল!

"কিন্তু অতি ক্ষণস্থায়ী এ আনন্দ। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬০ সালেই দেখা গেল ক্যারিবুর সংখ্যা অস্বাভাবিক দ্রুততার সংগে কমছে। পরের বছরই তাদের সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র দু-লক্ষে। কারণ কী? খোঁজ করে জানা গেল, বিভিন্ন সংক্রামক রোগে হাজারে হাজারে হরিণ মারা পড়েছে। কারণ ওই একই। রোগগ্রস্তদের মেরে ফেলার কেউ নেই। আর পরিশ্রমহীন ক্যারিবুদের রোগের আক্রমণও হচ্ছে অতি সহজে।"

"তাহলে, তুমি বলতে চাও, মানুষ এসব প্রাণী শিকার করবে না? বাঘ, সিংহ, চিতা পুমা, নেকড়ে মারবে না?"

"মারবে বইকী। কিন্তু হিসেব করে। কোনো প্রজাতির যদি কোনো কারণে অত্যধিক বৃদ্ধি হয়, তখন মারবে। কিন্তু ততটুকুই মারবে, যতটা প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে কমানো দরকার। এই দেখো না, যদি ওভাবে নির্বিচারে নেকড়ে না মারা হত, তাহলে ক্যারিবুদের এই দুর্দশাও হত না। তা নয়তো কী আমেরিকার বাইসন ধ্বংসের মতো মহাযজ্ঞ করবে নাকি?"

"বাইসন ধ্বংস? সে আবার কী? আমেরিকার এমন যজ্ঞ হয়েছিল নাকি?" পিন্টু জিজ্ঞাসা করে।

"ধ্বংস বলে ধ্বংস! রাম-রাবণের বংশের সবাইকে মারেনি। গুটি কয়েক রেখে দিয়েছিল। বিভীষণ তো ছিলই। কিন্তু মার্কিনিরা বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করেছিল বাইসন বংশে বাতি দিতে আর কাউকেই রাখবে না।"

"কত বাইসন ছিল সেখানে?"

"বাইসন কি মোষ?" আমরা জানতে চাই।

"হ্যাঁ বাইসন এক ধরনের মোষ। আমেরিকায় তাকে বাফেলো বা মোষই বলা হত। আর সংখ্যা? সপ্তদশ শতকের শুরুতে আমেরিকায় বাইসনের সংখ্যা ছিল অগুণতি। বহু বহু কোটি। কেউ বলেন দশ কোটি, কেউ বা বিশ কোটি।"

"এই বিশ কোটি প্রাণীকে মেরে শেষ করে দিল মানুষ?"

"তাই তো দিল। অথচ তার আগে—" এই পর্যন্ত বলে কুট্টিমামা দম নিল। তারপর বললে, "সে কথায় যাবার আগে বল তো আমেরিকার আদিম অধিবাসী কারা?"

"কেন? আমেরিকানরা।" মিনুর সাফ্ উত্তর।

"দুর্, তা কেন? আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানরা।" পিন্টু তার বিদ্যে জাহির করে।

"কিন্তু রেড ইন্ডিয়ান কেন?" কুট্টিমামা জানতে চায়।

"তার মানে?"

এবার বিল্টু মাঠে নামে, "রেড ইন্ডিয়ান, কারণ কলম্বাসের ভুলে। কলম্বাস মনে করেছিল ভারতে পৌঁছেছে। তাই এরা ভারতীয় বা ইন্ডিয়ান। পরে ভুল ভাঙার পরে সবাই নাম দিল রেড ইন্ডিয়ান। আমাদের, অর্থাৎ ইন্ডিয়া থেকে এদের আলাদা করতে।"



"যাই হোক এরা কোথা থেকে সে দেশে এসেছিল জানিস?"

এটার উত্তর আমাদের জানা ছিল না। মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে কুট্টিমামাই উত্তর দিল।

"সে প্রায় তিরিশ-চল্লিশ হাজার বছর আগেকার কথা। এশিয়া থেকে

একদল মানুষ হেঁটে হেঁটে উত্তর আমেরিকার আলাস্কা দিয়ে সে দেশে ঢুকেছিল।”

“হেঁটে যাবে কী করে? এশিয়া আর আমেরিকার মাঝখানে তো সমুদ্র। বেরিং প্রণালী।” ঝন্টু তার ভূগোলের বিদ্যে ফলায়।

“আজ সমুদ্র, কিন্তু সেদিন ছিল না। সেকালে এ দুটো মহাদেশের মধ্যে প্রণালীর বদলে ছিল যোজক। এশিয়া-আমেরিকা ভূমি দিয়েই যুক্ত ছিল।

“যাইহোক প্রথমে গেল একদল। তারপর আর একদল। এরপর অনেক অনেক। আর এরা ক্রমশ দক্ষিণের দিকে যেতে লাগল। তারপর যেতে যেতে দক্ষিণ আমেরিকাতেও গিয়ে পৌঁছোল। এ কিন্তু এক-আধ দিনের ব্যাপার নয়। এক-আধ বছরেরও নয়। হাজার কয়েক বছরের কথা। বেশ কয়েক হাজার বছর পরে এরা সমগ্র আমেরিকা ভূখণ্ডেই ছড়িয়ে পড়ল। যোগাযোগ না থাকায়, এদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে উন্নত হতে লাগল। এদের ভাষা আলাদা হয়ে গেল। সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে এদের বিভিন্ন গোষ্ঠী অবস্থান করতে লাগল। মোটামুটি এই হল রেড ইন্ডিয়ানদের বিবরণ।”

“তা, এর মধ্যে বাইসন এল কোথা থেকে?”

“আসেনি। এবার আসবে। একদিন এই রেড ইন্ডিয়ানরা মূলত খাদ্যের অভাবেই এশিয়া ছেড়ে বেরিয়েছিল। আবার এই মহাদেশে এসেও স্থান বৈচিত্র্যের জন্য এদের নানা ধরনের খাদ্যাভ্যাস হল। স্থান বিশেষে এদের বাসস্থান, আচার-আচরণ সব বিভিন্ন প্রকার হয়ে দাঁড়াল।

“যেমন, যারা সমুদ্রের কাছাকাছি থাকত, তারা মূলত মৎসজীবি ও মৎসভোগী হল। আবার যারা সমতলে থাকত ও চাষবাস আবিষ্কার করে ফেলল, তারা দানা শস্য, বিশেষ করে ভুট্টা, আলু এসব খেতে শিখল।

“একটা বড়োগোষ্ঠী—একটা কেন, বেশ কিছু গোষ্ঠী নির্ভরশীল হল শিকারের ওপর। তখন মধ্য আমেরিকা জুড়ে কোটি কোটি বাইসন ঘুরে বেড়াচ্ছে। যারা তার কাছাকাছি থাকত, তারা হল বাইসন শিকারি।

“এসব গোষ্ঠীরা বাস করার জন্য যেসব টেপি (Tepee) বানাত, তা হত বাইসনের চামড়ায় তৈরি। এদের পোশাক পরিচ্ছদ, এমনকী জুতো

বানানো হত বাইসনের চামড়া দিয়ে। তাদের খাদ্য তালিকায় সবচেয়ে বেশি থাকত বাইসনের মাংস। তারা অস্ত্র বানাত বাইসনের হাড় দিয়ে। শীতের দিনে গায়ে দিত বাইসনের চামড়ার কম্বল। ধনুকের ছিলা বানাত বাইসনের নাড়ি দিয়ে। তাই দিয়েই বানানো হত পশু ধরবার ল্যাসো। এদের সকলের সভ্যতাই ছিল বাইসন-নির্ভর। এমনকী কোনো কোনো গোষ্ঠী ছিল যাযাবর। তারা বাইসন পালের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াত, যাতে খাদ্যের ভাণ্ডারে টান না পড়ে।

"এভাবেই চলেছিল হাজার হাজার বছর। নিদেনপক্ষে পনেরো-বিশ হাজার বছর তো বটেই। রেড ইন্ডিয়ানদেরও খাদ্য, পোশাকের আর তাঁবুর অভাব হয়নি। বাইসনের সংখ্যায়ও টান পড়েনি।

"কিন্তু সব গন্ডগোল হয়ে গেল এর পরেই। কলম্বাসের আমেরিকা পুনরাবিষ্কারের দেড়শো বছর বাদে।"

"কেন দেড়শো বছর বাদে কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

"কারণ যে অঞ্চলে বাইসনরা থাকত সেখানে পৌঁছোতে সাদা চামড়ার মানুষদের পরবর্তী একশো বছর লেগেছিল। কলম্বাস পৌঁছেছিলেন মধ্য আমেরিকার দ্বীপে। তারপর ক্রমাগত ইয়োরোপ থেকে দলে দলে মানুষ আমেরিকায় হানা দিয়েছে, সেখানে বসবাস করবে বলে। প্রথমে স্পেন, তারপর পর্তুগাল। এরপর ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ড—কোন দেশ না লোক পাঠিয়েছে নতুন আবিষ্কৃত মহাদেশ দখল করতে।"

"তাহলে বাইসনরা ছিল কোথায়?"

"তাদের বাসভূমি ছিল প্রধানত উত্তর আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চল। যেখানে অঢেল ঘাসের রাজত্ব। এটাই ছিল এদের হ্যাবিটাট বা স্বাভাবিক আবাসস্থল। আর এই বাইসনভূমিতে বাস ছিল কমপক্ষে লক্ষাধিক রেড ইন্ডিয়ানের। তারা ছিল নানা গোষ্ঠীর।"

"তাহলে এই বাইসনদের আবিষ্কার করল কে?"

"আবিষ্কার আবার করবে কী? এ কি কোনো নতুন জিনিস? যেমন আমেরিকা মহাদেশ আগে থাকতেই ছিল। রেড ইন্ডিয়ানরা ছিল। তেমনি

বাইসনরাও ছিল। সাদা চামড়ার মানুষরা এদের কবে প্রথম দেখেছিল, তাকে যদি আবিষ্কার বলে, তাহলে তা ঘটেছিল ১৬১২ সালে। এক ব্রিটিশ নাবিক নৌকো নিয়ে পোটোম্যাক নদীর উজানে চলেছিল। হঠাৎ জঙ্গলের আড়াল সরে যেতে তার নজরে পড়েছিল দৃশ্যটা। পরবর্তীকালে তার বর্ণনা অনেকেই বিশ্বাস করেনি। কিন্তু পরে যখন অনেকেই বিশাল বিশাল বাইসনের পালের কথা বললেন, তখন আর অবিশ্বাসের উপায় রইল না। একজনের বর্ণনায় জানা যায় এরকম এক পাল বাইসনের কথা, যার দৈর্ঘ্য ছিল আশি কিলোমিটার আর প্রস্থে চল্লিশ।

"একবার ভাব দৃশ্যটা। বাইসনের পাল চলেছে তো চলেছেই। দিনের পর দিন তারা খাচ্ছে-দাচ্ছে আর চলেছে। ফুরোচ্ছে আর না। এমনি ছিল সেখানকার বাইসনের সংখ্যা।"

"সেই অত বাইসন কোথায় গেল? তারাও কি ক্যারিবু হরিণদের মতো রোগে মরে গেল?"

"একেবারেই না। তারা মারা গেল মানুষের হাতে।"

"অত কোটি কোটি বাইসন?"

"সপ্তদশ শতকের শুরু থেকেই বর্তমানে যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট বা ইউ এস এ, সেখানে আর কানাডায় বসতি করতে শুরু করল সাদা চামড়ার মানুষেরা। বেশিদিন লাগল না, দুশো বছরও নয়, ১৮০১ সালেই সারা প্রেইরি ভূমিতে একটাও বাইসন রইল না। আর ১৮৪০ এর আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে মিসিসিপি পর্যন্ত সমগ্র পূর্বভাগ থেকে বাইসন নির্মূল হয়ে গেল।"

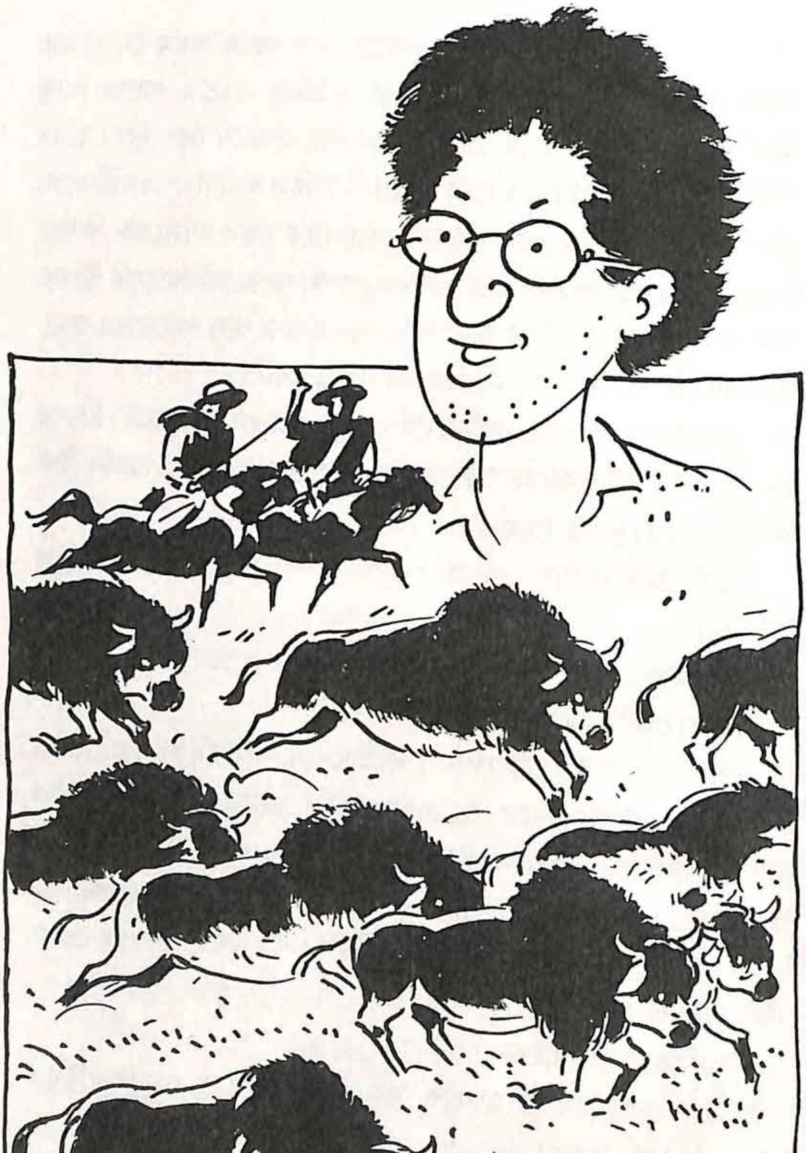
"পশ্চিম ভাগে বাইসন ছিল না?"

"ছিল তো! তাদের সংখ্যাও কম নয়, অন্তত ছ-কোটি বাইসন তখনও সেখানে ছিল।"

"তাদেরও মেরে শেষ করে দেওয়া হল?"

"হ্যাঁ তাদেরও। ভাব না একবার। এই বাইসন মারার মরশুম হত মাত্র দু-তিন মাস। এরকম একটা মাত্র মরশুমে মিসিসিপির পশ্চিমের কানসাস রাজ্যে দু-লক্ষ বাইসন মারা হয়েছিল।





"সে দেশে তখন নতুন রেলপথ পাতা হচ্ছে। লোককে রেলগাড়িতে চড়ানোর জন্য কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হত। এরকম একটা বিজ্ঞাপনে কী ছিল জানিস? 'আসুন-দেখুন। ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতগামী রেলগাড়িতে চড়ুন। বিশেষ আকর্ষণ! চলন্ত রেলগাড়িতে বসে বসে বাইসন শিকার করুন।'

"বাইসনদের সম্বন্ধে এই ছিল তাদের মনোভাব। রেলপথ বসানোর জন্য বিরাট সংখ্যক কুলি আমদানি করতে হয়েছিল। তাদের খাবার জন্য মাংস দরকার। রেল কোম্পানির নিজস্ব শিকারিরা তাদের জন্য বাইসন মেরে দিত। কিন্তু শুধু খাবার জন্য কি অত কোটি কোটি বাইসন শেষ করা যায়? তা যায় না। শিকারিদের ওপর নির্দেশ ছিল যেখানেই বাইসন দেখবে হত্যা করবে তাদের। দরকার থাকুক আর নাই থাকুক।"

"সে কী কথা? বিনা কারণে এদের মারা হল?"

"বিনা কারণে কেন হবে? কারণ একটা, একটা কেন বেশ কয়েকটাই ছিল। তবে সবচেয়ে বড়ো কারণ ছিল রেড ইন্ডিয়ানদের সর্বনাশ করা।"

"বাইসন মেরে, রেড ইন্ডিয়ানদের সর্বনাশ করা?" আমরা অবাক।

"ঠিক তাই। এই রেড ইন্ডিয়ানরা ছিল বীর, স্বাধীনচেতা। কারো কাছে মাথা নিচু করা তাদের ধাতে ছিল না। আর তারা এই নতুন আসা সাদা চামড়ার মানুষদের খুব ভালো চোখে দেখতও না। খুব স্বাভাবিক কারণেই।

"ওদিকে নতুন আসা ইয়োরোপীয়দের জমি দরকার। দরকার সমস্ত তৃণভূমি সাফ করে, জঙ্গল কেটে বড়ো বড়ো রাঞ্চ বা খামার বানানোর।

"অন্যের জমি দু-ভাবে দখল করা যায়। এক কিনে নিয়ে, অথবা কেড়ে নিয়ে। তা কিনে নেওয়ার চেয়ে কেড়ে নিলেই ভালো। কারণ তাতে খরচ নেই। তাই প্রথম দফায় চলল জমি কেড়ে নেওয়া। রেড ইন্ডিয়ান মেরে তাড়ানো, কিংবা হত্যা করা। রেড ইন্ডিয়ানরাও তো বীর! ততদিনে তারা ইয়োরোপীদের ঘোড়া আর বন্দুকও কব্জা করে ফেলেছে। অত সহজে তারা হার মানবে কেন?



"তাই এবার চেষ্টা চলল তাদের ভাতে মারবার। যেহেতু তাদের একটা বিরাট অংশ সম্পূর্ণভাবে বাইসনের ওপর নির্ভরশীল, তাই রেড ইন্ডিয়ানদের জব্দ করার সর্বোত্তম উপায় বলে তাদের মনে হয়েছিল বাইসন বংশ নির্বংশ করা। তার ওপর রাঞ্চ বানালে সে ফসল রাখতেও প্রয়োজন বাইসন নিধন। এগুলোই ছিল কারণ।"

"কত বাইসন এভাবে মারা হয়েছিল?"

"কত, তার হিসেব নেই। সরকারের পক্ষ থেকেই স্বেচ্ছাসেবক শিকারিদের বিনে পয়সায় গুলি আর বন্দুক দেওয়া হত বাইসন মারবার জন্য। ১৮৭০ থেকে ১৮৭৫ পর্যন্ত এক সরকারি হিসেবেই দেখা যাচ্ছে। বছরে পঁচিশ লক্ষ করে বাইসন হত্যা করা হয়েছে। মাত্র পাঁচ বছরে নাকি সাড়ে সাতকোটি বাইসন মারা হয়েছিল।"

"অত বাইসন মারা হত, তাদের মড়াগুলি পচে গন্ধ ছড়াতো না?" মিনু প্রশ্ন করে।

"ছড়াতোই তো। এত বেশি মৃত দেহ। তাদের নষ্ট করার উপায় তো ছিল না। প্রথম প্রথম তাদের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হত। কেউ কেউ আবার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বাইসনদের জিভ আর ল্যাজ কেটে রেখে দিত। শেষদিকে তাও সম্ভব হত না। শেষ যে বড়ো দল, তাতে ছিল দশহাজার প্রাণী। ১৮৮৩ সালে তাদেরও শেষ করে দেওয়া হল।"

"কিন্তু ইয়োরোপীয়রা যা চাইছিল, তার মানে রেড ইন্ডিয়ানদের জব্দ করা। তা কি হল শেষ পর্যন্ত?"

"সবটা না হলেও বেশ খানিকটা হল। বেশ কিছু উপজাতিগোষ্ঠী খিদেয় আর শীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বাকিদের অবশ্য শেষ পর্যন্ত মেরে আর বন্দী করে শেষ করতে হয়েছিল।

যাক্‌গে এখন তোরা বাড়ি যা। নইলে ও বাড়িতে সবাই চিন্তা করবে।"

খুব ভারাক্রান্ত মনেই ফিরে এলাম পাঁচজনে। সারাপথ কারো মুখে কথাটি নেই।

সন্ধেবেলা পড়তে বসেছি। বিল্টুটা কোত্থেকে হাজির। হাতে একটা মোটা বই।

"বড়দা এটা দ্যাখো।" হাতের বইটা দেখায়। "কুট্টিমামার কথায় একটু হলেও গুল থাকবেই। চেক দেশের প্রিডমোস্ট এলাকার সেই চাষি জোসেফ ক্রোমেচেক বেঁচে ছিলেন গত শতাব্দীর শেষ দিকে। হাড়গুলি পাওয়া গিয়েছিল ১৮৮০ সালে। তাহলে তার পাঠানো হাড়ের কাহিনি কুট্টিমামার গঞ্জ হ্রস্বউ—"

"লয় পয় তো? ঠিক আছে, একথা আর কাউকে বলে কাজ নেই। বাকিটা তো সঠিক!"





মিনুদের কোন এক মামা বিলেতে থাকেন। তিনি মিনুকে একটা সুন্দর টেডি বিয়ার পাঠিয়েছেন। নরম ফারের তৈরি ভালুক। দেখলেই চটকাতে ইচ্ছে করে। এগুলো অবশ্য আসল ফার নয়। নকল, তবু কী সুন্দর!

মিনু সেই টেডিটা সবাইকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। কুট্টিমামা আমাদের বাড়িতে আসতে, তাকেও দেখাল।

কুট্টিমামা হাতে নিয়ে বলল, "বাঃ বড়ো চমৎকার তো! ঠিক একেবারে কোয়ালা ভালুক।"

"কোয়ালা নয় কুট্টিমামা। একে বলে টেডি বিয়ার।" মিনু মামার ভুল সংশোধন করে দেয়।

"ওই হল। এই কোয়ালা ভালুকের নকলেই টেডি তৈরি হয়েছে। কোয়ালাগুলোও দেখতে অমনধারা। চেহারায় শুধু নয়, চোখের দৃষ্টিটা পর্যন্ত।"



"কোয়ালা ভালুকটা কী জিনিস কুট্টিমামা?" ওমলেটের শেষ টুকরোটা মুখে পুরতে পুরতে বিল্টু জানতে চায়।

"কোয়ালা এক ধরনের মারসুপিয়াল প্রাণী।"

"এ যে 'বাঘ মানে শার্দুল' হল।" কাকা খাবার টেবিলের একধারে বসে কাগজ পড়ছিলেন। বোঝা গেল, আমাদের কথাও শুনছিলেন।

"ঠিক! মারসুপিয়াল মানে কী?" বিল্টু তার বাবাকে সমর্থন করে।

"মারসুপিয়ালরা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রাথমিক স্তরে। তারা পুরোপুরি স্তন্যপায়ীদের মতো হয়ে ওঠেনি। তাদের ডিম ফুটে বাচ্চা হয় না বটে, কিন্তু বাচ্চারা জন্মের পর থাকে অপরিণত, আর অসহায়। তারা তাই বেশ কিছুদিন মায়ের পেটের সামনের এক থলিতে বাস করে।"

"ক্যাঙারু" মিনু চেঁচিয়ে ওঠে।

"ঠিক তাই। শুধু ক্যাঙারু নয়। এই কোয়ালারাও মারসুপিয়াল। অমন নেকড়ে আছে, শেয়াল আছে, ইঁদুর আছে। অনেক প্রাণীই আছে। আর এ সবই আছে প্রধানত অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে।"

"কেন? অস্ট্রেলিয়ায় কেন? অন্য কোথাও এ ধরনের প্রাণী নেই? এতক্ষণে আমার খাওয়া শেষ হয়েছে।

"সেটা বোঝাতে গেলে ভূতত্ত্ব বা জিওলজি বোঝাতে হবে। তবে মোটামুটি বলতে গেলে ঃ একসময় পৃথিবীর সমস্ত ভূখণ্ড অর্থাৎ মাটি ছিল একসঙ্গে। একজোট হয়ে। ভূতাত্ত্বিক কারণে একসময় এরা আলাদা আলাদা হয়ে গেল।"

"কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্‌ট।" কাকা টিপুনি কাটেনা।

"হ্যাঁ। আর সে কারণেই এই বিশেষ বিশেষ মহাদেশে মারসুপিয়াল দেখা যায়।

"আসলে পণ্ডিতরা বলেন আজ থেকে প্রায় দশ কোটি বছর আগে ক্রেটাশিয়াস যুগে মারসুপিয়ালদের বা থলেওয়ালা প্রাণীদের উদ্ভব। আর এদের উদ্ভব হয়েছিল কিন্তু আমেরিকা ভূখণ্ডে। তখন আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়া ভূভাগ বা যোজক দিয়ে জোড়া ছিল। তাই দিয়েই এরা অস্ট্রেলিয়া, নিউগিনি, টিমর আর সেলেবিস দ্বীপগুলিতে আশ্রয় নেয়। কালক্রমে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ভূযোজক ধ্বংস হয়ে গেলে এ দেশগুলি আলাদা হয়ে পড়ে। সে দেশগুলিতে এখনও অন্তত একশো পঁচাত্তরটি মারসুপিয়াল প্রজাতির দেখা মেলে। আমেরিকা থেকে অবশ্য



এ ধরনের থলেওয়ালা প্রাণী একবারে অদৃশ্য হয়নি। অন্তত দুটি গোত্রের (ফ্যামিলি) সত্তরটি প্রজাতির প্রাণী মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় আছে। ওপোস্যাম (opossum) এমনই একটি প্রাণী, যা আমেরিকায় আছে। এর মধ্যে এক দুটি প্রজাতি উত্তর আমেরিকাতেও হানা দিয়েছে। এর বাইরে আর কোথাও মারসুপিয়ালদের দেখা পাওয়া যায় না। তবে মূলত এদের সাক্ষাৎ মেলে অস্ট্রেলিয়া আর তার আশেপাশের দ্বীপেই।"

"অন্য কোথাও পাওয়া যায় না কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

"প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন হয়তো সব দেশেই এরা গিয়েছিল। কিন্তু ওই যে 'স্ট্রাগল ফর এক্‌জিস্‌টেন্স্'। জীবনযুদ্ধে এরা স্তন্যপায়ীদের কাছে পরাজিত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় হল অন্য ঘটনা। যেহেতু সাড়ে ছ-কোটি বছর আগে টারসিয়ারি যুগে অস্ট্রেলিয়া ভূখণ্ড পৃথিবীর অন্য সব ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তাই সেখানকার জীব বিবর্তন অন্য পথে চলল। স্তন্যপায়ীরা এল না। তাই মারসুপিয়ালদের হ্যাবিটাট বা আবাস কেড়ে নিল না কেউ। এরাই রাজত্ব করতে লাগল। আবাসগুলি, আনাচ-কানাচগুলি দখল করল এরাই।

"অন্য মহাদেশে যে আবাস ক্ষুরওয়ালা প্রাণীদের দখলে, এখানে সেটা দখল করে নিয়েছিল ক্যাঙারুরা। বৈচিত্র্য তো বহু রকমের কিনা! উচ্চতায় ছয় ফিট আর দৈর্ঘ্যে নয় ফিট ম্যাক্রোপাস জাইগান্টিয়াস বা খয়েরি ক্যাঙারু থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাঁচ ইঞ্চি লম্বা মারসুপিয়াল ইঁদুর পর্যন্ত সবাই দখল করে নিয়েছে নিচ্‌গুলি।"

"এসব তথ্য সঠিক তো?" কাকার গলা শোনা গেল। তিনি যে এক মনে কুট্টিমামার কথা শুনে যাচ্ছেন খেয়াল করিনি।

"এক্কেবারে ঠিক। লেটেস্ট এনসাইক্লোপিডিয়া মিলিয়ে নেবেন। মাইক্রোপিডিয়াতেই আছে।" ভারিক্কি চালে জবাব দেয় কুট্টিমামা।



"যাক্‌গে। কথা হচ্ছিল টেডি বিয়ার বা কোয়ালা বিয়ারদের নিয়ে। এদের কথাই বলি। এরা কিন্তু তোর টেডির মতো ছোটোখাটো নয়। আবার বিশাল বড়োও নয়। একটা পূর্ণবয়স্ক কোয়ালা একুশ ইঞ্চি থেকে তেত্রিশ ইঞ্চি (৬০ থেকে ৮৫ সেন্টি মিটার) পর্যন্ত বড়ো হয়। ওজন হয়

প্রায় ১৫/১৬ কেজি। ল্যাজ প্রায় নেই বললেই চলে। গায়ের রং হালকা রুপালি থেকে হলদেটে। ছোটো ছোটো হলদে চোখ, নরম কান আর গোল গোল চকচকে নাক। এরা প্রধানত গাছে গাছে থাকতেই ভালোবাসে। আর প্রধান খাদ্য বিশেষ বিশেষ প্রজাতির ইউক্যালিপটাসের পাতা। খায় খুব একটা কম নয়। একেক জনের জন্য প্রায় ১ কেজি তিনশো গ্রাম পাতা এদের চাই। একবারে একটি মাত্র বাচ্চা হয়। অপরিণত। ফলে মায়ের থলিতে দুধ খেয়ে কাটে প্রায় সাত মাস।

"মজা হল এর পরেও এরা মায়ের আঁচল (!) ছাড়ে না। তখন জায়গা নেয় মায়ের পিঠে। এমনও দেখা যায়, মা কোয়ালার পিঠে তিন বয়সের তিনটে কোয়ালা আঁকড়ে ধরে রয়েছে।"

"কদ্দিন বাঁচে এরা?"

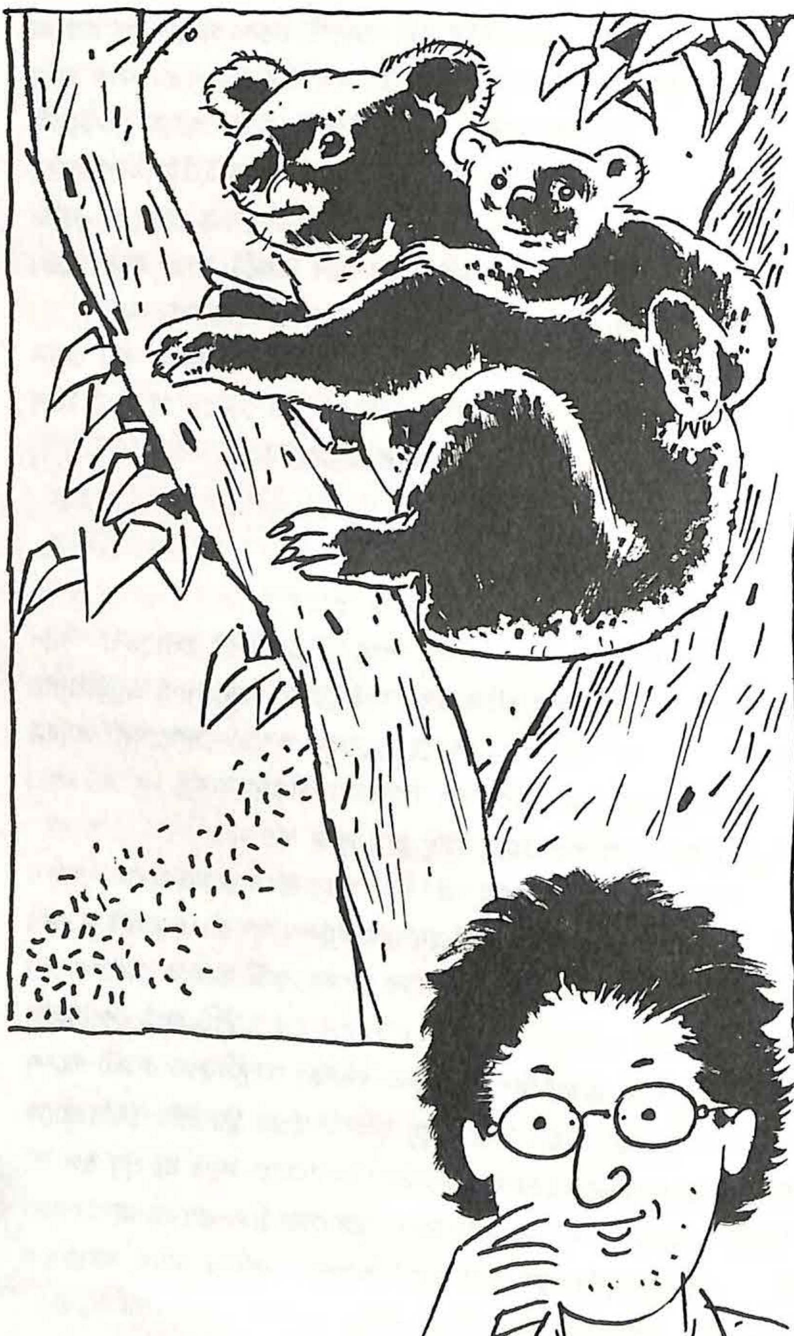
"তা প্রায় বছর কুড়ি।"

"এরা কি অন্য ভাল্লুকদের মতোই হিংস্র?"

"একেবারে উলটো। খুবই শান্ত। ওদেশের লোকেরা বলে কোয়ালাকে রাগানো খুব কঠিন কাজ। যাই হোক, কোয়ালারা অস্ট্রেলিয়ায় বহু বহু হাজার বছর ধরে আছে। যেমন আছে সেদেশের আদিম অধিবাসীরা। তারা মাংসের জন্য কোয়ালা শিকার করত না, তা নয়। কিন্তু কোয়ালা বংশের তাতে কিছু হ্রাস বৃদ্ধি হত না।

"এল সেই সাদা চামড়ার দল। কোয়ালার মাংস যেমন সুস্বাদু; তাদের গায়ের চামড়া তেমনি মসৃণ। গায়ের লোমগুলিও সুন্দর। এগুলোই তাদের কাল হল। ইয়োরোপের হঠাৎ নবাবদের গায়ের কোট বানাতে কোয়ালাদের প্রাণ দিতে হল একটু বেশি সংখ্যায়। ১৯২৪ সালে কুড়ি লক্ষ কোয়ালার চামড়া রপ্তানি করা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া থেকে। অস্ট্রেলিয়ার একটা প্রদেশ কুইন্সল্যান্ড। এক ১৯২৭ সালে, শুধু কুইন্সল্যান্ডেই ছয় লক্ষ কোয়ালাকে হত্যা করা হয়েছিল। এভাবে কোয়ালা হত্যার সঙ্গে সঙ্গে যা শুরু হল তা আরও সাংঘাতিক। কী এক সংক্রামক রোগ দেখা দিল তাদের মধ্যে। দলে দলে এই নিরীহ প্রাণীগুলো মারা পড়তে লাগল। একদিকে অসুখ, অন্যদিকে শিকারিরা। কোয়ালারা বাঁচে কী করে?"





"এভাবে এই সুন্দর প্রাণীগুলোকে মারতে লোকগুলোর একটু মায়া হল না?" মিনুর চোখে সত্যিই জল।

"নাঃ। কারণ তখন তাদের লোভের সামনে আর কিছুই নেই। সবচেয়ে প্যাথেটিক কী জানিস? কোয়ালাদের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরলে, তারা করুণ চোখে শুধু তাকিয়ে থাকে। আর গুলি লাগলে, আহত হলে ডুকরে কেঁদে ওঠে। না জানা থাকলে, যে কেউ মানুষের শিশুর কান্না বলে তাকে ভুল করবে। ঠিক যেন বাচ্চার কান্না! আর লোকগুলো ছিল এমন নিষ্ঠুর, কোনো আহত কোয়ালা যদি কোনোরকমে গাছের ডাল ধরে ঝুলে থাকত, তাকে সেই অবস্থায় রেখেই শিকারিরা চলে যেত। গাছে উঠে কোয়ালা কুড়োবার সময় তখন তাদের নেই।

"প্রথম মহাযুদ্ধের আগে শুধু মধ্য-দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া থেকেই প্রতি বছর দশ থেকে কুড়ি লক্ষ কোয়ালার চামড়া রপ্তানি করা হত। ১৯২৭ সালে, এক বছরেই কুইসল্যান্ডে দশ হাজার শিকারিকে পারমিট দেওয়া হয়েছিল কোয়ালা মারবার জন্য। তার কারণ কী জানিস? শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের ভোট। সে দেশের সরকার জানত এদের ভোট না পেলে নির্বাচনে জেতা যাবে না। আর এদের খুশি করতে হলে, পারমিট দিতে হবে শিকারের—কোয়ালা শিকারের। কারণ এই কোয়ালার চামড়া বেচেই এই শ্বেতাঙ্গ ভোটাররা প্রচুর পয়সা করছে আর করবে।

"মজার ব্যাপার হল, দেশটা যাদের, অর্থাৎ সে দেশের আদিম অধিবাসী, তাদের কিন্তু ভোটাধিকার ছিল না। তাদের তখন মানুষ বলেই মনে করা হত না।

"যাই হোক অস্ট্রেলীয় সরকারের অবশেষে ঘুম ভাঙল। যখন ঘুম ভাঙল, তখন মাত্র কয়েকশো কোয়ালা বেঁচে আছে। এবার সবাই মিলে উঠে পড়ে লাগল কোয়ালাদের রক্ষা করতে। কিন্তু একটা বড়ো মুশকিল ছিল। কোয়ালাদের অন্য কোনো দেশে নিয়ে গিয়ে বাঁচানো সম্ভব নয়। কারণ তাদের মূল খাদ্য ইউক্যালিপ্টাসের পাতা। তাও আবার এক-এক ঋতুতে এক-এক প্রজাতির ইউক্যালিপ্টাস হওয়া চাই। সুতরাং অস্ট্রেলিয়াতেই তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হল। অনেক অনেক চেষ্টায় তারা

এতদিনে রক্ষা পেয়েছে। জীববিদ্‌রা বলছেন ঃ আর ভয় নেই। এবার যদি আর মানুষ অমন ভুল না করে, কোয়ালা বংশ রক্ষা পেল।"

কাকিমা তাগাদা দিলেন, "কী ব্যাপার তুমি কি অফিস-টপিস যাবে না? কটা বাজল খেয়াল আছে?"

"ওমা, তাই তো। নটা বাজে—বড্ড দেরি হয়ে গেল। এই যে, কুট্টি এমন গল্প ফাঁদল, শেষ না শুনে ওঠাও যায় না।" বলতে বলতে কাকা তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠলেন।

"গল্প নয় ছোড়দা, সত্য! নির্ভেজাল সত্য।" কুট্টিমামা প্রতিবাদ করে উঠল।





স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই মিনু চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ঢুকল। “মা, বাবার সেই কাটগ্লাসগুলো থেকে একটা বের করে দাও না।”

“কেন, তা দিয়ে কী করবি শুনি?”

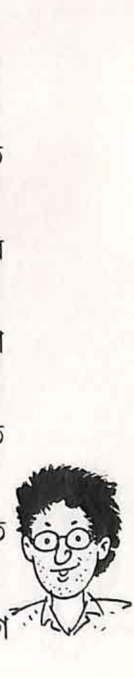
“কী সুন্দর ফুল এনেছি, বসার ঘরের টেবিলে রাখব।”

কাকিমা বোধ হয় রান্নাঘরে ছিলেন। একটা ছোটো তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে আমাদের পড়ার ঘরে ঢুকলেন।

আমি আজ তাড়াতাড়িই ফিরেছি। বসে প্র্যাকটিকাল খাতা তৈরি করছিলাম।

কাকিমা ঘরে ঢুকেই আঁতকে ওঠেন, “করেছিস কী? এ তো কচুরিপানার ফুল। এ কেউ ঘরে আনে? ফেলে দে বাইরে।”

“বা রে, কী সুন্দর ফুল। কী সুন্দর রং। আর তুমি ফেলে দিতে বলছ? আমি বলে কত কষ্ট করে আনলাম।”



“কষ্ট করে মানে? তুই আবার পুকুরে নেমেছিলি? একবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েও লজ্জা নেই?”

মিনুদের স্কুলের পেছনেই একটা বড়ো পুকুর। বছর তিনেক আগে

হাত দিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে মিনু আর তার এক বন্ধু জলে পড়ে গিয়েছিল। কাকিমা সে কথাই মনে করিয়ে দিলেন।

"আমি তুলব কেন? বিপুলদা ছিল না সঙ্গে? তাকেই তো বললাম। আর তাই বিপুলদা তুলে দিল।"

বিপুলদা ওদের স্কুলেই কাজ করে। আর মিনুদের মতো কজনকে রাস্তা পার করে দিয়ে অতিরিক্ত কিছু রোজগারও করে।

"তা বলে কচুরিপানার ফুল কেউ ঘরে রাখে না। এ জঞ্জাল। এ তুমি দূর করো বলছি।" কাকিমার সুরটা অবশ্য একটু নরম, মিনু নিজে জলে নামেনি শুনে।

"কী জঞ্জাল? কাকে দূর করবে দিদি?" ঝোলা কাঁধে কোথা থেকে কুট্টিমামার আবির্ভাব।

"আর বলো কেন? এই দেখো না, তোমাদের আদরের ভাগনি কোত্থেকে কচুরিপানা নিয়ে এসে বলে, ঘর সাজাব। বলছে কী সুন্দর ফুল!"

"তা তো বলবেই। সত্যিই তো কচুরিপানার ফুল সুন্দর। আর তাই দেখেই তো মেমসাহেব কিংবা সাহেব ভুলেছিল। আর সে ভুলের খেসারত দিচ্ছি আমরা—আজও।"

নাঃ, প্র্যাক্টিক্যাল খাতাটা বন্ধ করতেই হল।

"মেমসাহেব ভুলেছিল মানে? কচুরিপানার ফুল দেখে?"

"হ্যাঁ, তাই তো ভুলেছিল।" কুট্টিমামা আজকাল এমন সব সাংকেতিক কথাবার্তা বলে না, বোঝা যায় না।

বিল্টু কখন এসে গেছে খেয়াল করিনি। "একটু খোলসা করে বলো না কুট্টিমামা। অমন ধাঁধার মতো কথা বলো কেন?"

"না রে, ধাঁধা নয়, সত্যি তাই হয়েছিল।



"সেটা উনবিংশ শতকের শেষদিক। কোনো এক মার্কিন সাহেব আর তার গিন্নি গিয়েছিলেন ব্রেজিলের গহন জঙ্গলে। হয়তো শিকার করার লোভে কিংবা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে। কে জানে? জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে তাদের নজরে এল এমনি এক হালকা ভায়োলেট রঙের ফুল। 'হাউ

লাভলি, হাউ লাভলি' করে তো মেমসাহেব নেচে অস্থির। সাহেবেরও ভালো লাগল সে ফুল। সঙ্গের কুলিদের নামালেন জলে। তারা তুলে দিল কটি ফুল সমেত গাছ। অন্য আরও অনেক কিছুর সঙ্গে এটিও মেম সাহেব নিয়ে এলেন, তাদের লুইসিয়ানার পুকুরে ছাড়বেন বলে।

"কী সুন্দর গাছ, আর কী সুন্দর তার ফুল। যখন পুকুরে এ ফুল ফুটবে, লুইসিয়ানার বাড়ির আরাম কেদারায় বসে এর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কত স্মৃতিই না মনে আসবে। ব্রেজিলের জঙ্গলের এই রোমাঞ্চকর অ্যাভভেঞ্চারের স্মৃতি মন্থন করেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দিন কাটবে।

"আনলেন তো তুলে। জলে ছাড়লেনও। তখন কি জানতেন, কী সর্বনাশা অভিশাপ তারা সঙ্গে করে নিয়ে এলেন? নিশ্চয়ই জানতেন না। জানলে নিশ্চয়ই আনতেনও না।

"বেশিদিন লাগল না। ১৮৮৪ সালেই লুইসিয়ানার জলে কচুরিপানার নিঃশব্দ আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। ১৮৯০তে ফ্লোরিডায়। আতঙ্কিত হয়ে উঠল সে দেশের সরকার।"

"কেন? আতঙ্কিত কেন?"

"আতঙ্ক হবে না? যেদিকে তাকাও কোথাও জল দেখা যায় না। শুধুই কচুরিপানা। সে কচুরিপানার ভিড় ঠেলে, নৌকো চলে না। মাছেরাও বুঝি বাঁচে না। আর এর সঙ্গে এসে গেল, মশা, মাছি, নানা পোকা। ফলে, নানান নতুন নতুন রোগ।

"ফুলের রূপে ভুলে, অমনি কে একজন একে নিয়ে এসেছিল সেই সুদূর অস্ট্রেলিয়াতে—কুইন্সল্যান্ডে। বৈজ্ঞানিক নামটাও খুব জমকালো। পন্টিডেরিয়াসি গোত্রের 'আইকর্নিয়া ক্র্যাসিপেস'। নাম আর রূপ যত সুন্দরই হোক না কেন, সবাই চ্যাঁচাতে লাগল, 'নির্মূল করো, নির্মূল করো একে।' কিন্তু বললেই তো আর নির্মূল হয় না। এ যে রাবণের বংশ! কোথাও কোনো একটা টুকরো থেকে গেলে, আবার ছড়িয়ে পড়ে দেখতে দেখতে। ১৮৯৫ সালে এদের দেখা গেল অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যে।

"১৯০৮ সালের আগেই রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করা হল কোচিন চীনে।"





"কোচিন চীন আবার কোন দেশ?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

"জানিস না? পরবর্তীকালে এ দেশকে বলা হত ইন্দোচীন। এখন যেখানে ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া সে সবটাকে মিলিয়েই ছিল কোচিন চীন।

"যাইহোক, এ জিনিস এবার ছড়াল ব্রহ্মদেশে। ১৯১৩ সালের ঘটনা। ১৯১৪ সালে সেখানে আদেশ জারি করা হল কচুরিপানা ধ্বংসের জন্য। বাধ্যতামূলক করা হল সব সক্ষম লোককে কচুরিপানা ধ্বংসের কাজে যোগ দেবার জন্য। ১৯১৭ সালে কচুরিপানা নষ্ট করতে বিশেষ আইন করা হল।

'ইতিমধ্যে আমেরিকায় পানা ধ্বংসের জন্য নানারকম চেষ্টা চলতে লাগল। এক ১৯১৯ সালে শুধুমাত্র ফ্লোরিডাতেই এ বাবদ খরচ করা হয়েছিল দুই লক্ষ পঁচানব্বুই হাজার ডলারেরও বেশি। আজকের হিসেব নিদেনপক্ষে তিরিশ-চল্লিশ কোটি টাকা। তাহলে ভাব কী সাংঘাতিক অবস্থা।"

"কিন্তু আমাদের দেশে এ পানা এল কীভাবে?" আমার প্রশ্ন।

"কবে প্রথম এদেশে পানা আসে, তা কেউ জানে না। তবে প্রথম মহাযুদ্ধের আগে তো বটেই।"

"এই বলছ কেউ জানে না। আবার বলছ প্রথম মহাযুদ্ধের আগে।"

"তার কারণ গোটা বাংলায়, মনে রাখিস তখন কিন্তু অবিভক্ত বাংলা, গোটা বাংলায় একটা গুজব রটে ছিল, যে জার্মানরা ইংরেজদের জব্দ করার জন্য এদেশে কচুরিপানা ছেড়ে দিয়েছে। মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজদের সঙ্গেও তো জার্মানদের লড়াই চলছিল। তখন এ পানার নামই হয়েছিল 'জার্মান পানা'। তাই মনে হয় প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই, মানে বেশ কিছু আগেই পানা এদেশের জলে আশ্রয় নিয়েছিল। কারণ ইতিমধ্যেই তার অপকারিতা সবার জানা হয়ে গিয়েছে।"

"কী জানি বাবা, হতেও পারে। জার্মানরা খুব চালাক জাত।" কাকিমা যে তখনও বসে আছেন, কেউ খেয়াল করেনি।



"না, না। জার্মানরা এ বিষ ছড়িয়েছে, এমন কোনো প্রমাণ নেই। তবে আরও একটা গুজব বাজারে ছিল।"

"কী গুজব?"

"ঢাকার নারায়ণগঞ্জে এক সাহেব বাস করতেন। জর্জ মর্গান। সেটা ১৯১০ সালের ঘটনা। হঠাৎ বাজারে রটে গেল ওই মর্গান সাহেব বা তার স্ত্রী বিদেশ থেকে মিনুরই মতো ওই ফুলের শোভায় মোহিত হয়ে কচুরিপানা এনে জলে ছেড়ে ছিলেন। আর সেটাই বংশ বৃদ্ধি করে দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে।

"ব্যস। পানার নতুন নামকরণ হয়ে গেল 'মর্গান পানা'। এটাও অবশ্য গুজব। কারণ, তারও আগেই যে পূর্ববঙ্গে কচুরিপানা ছিল তার প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন। যে-সে লোক নন। তার নাম খান বাহাদুর মৌলবি হেমায়েতুদ্দিন আহ্‌মেদ। নিবাস বরিশাল। তখনকার দিনের খুব নামজাদা ব্যক্তি। বাংলার কচুরিপানা সমিতির অন্যতম সদস্য।"

"কচুরিপানা সমিতি? সে আবার কী?" আমরা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করি।

"ওঃ, সে কথাই তো বলা হয়নি। তদানীন্তন সরকার ১৯২১ সালের বিশে জুন এক আদেশবলে এই সমিতিটি গঠন করেছিলেন। কে কে ছিলেন জানিস সে সমিতিতে?"

"কে কে ছিলেন?"

"সেই সমিতির সভাপতি ছিলেন স্যার জগদীশচন্দ্র বোস— কে টি, এফ আর এস, সি এস আই, সি আই এফ, ডি এস সি।

"আর সে সমিতির সভ্যদের মধ্যে ছিলেন, নদীয়ার রাজা, মহারাজা ক্ষৌনিশচন্দ্র রায় বাহাদুর, রায় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত বাহাদুর। এরা দুজনেই ছিলেন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। আর ছিলেন মৌলবি সাহেব, যার কথা আগেই বললাম। ছিলেন, কৃষি অধিকর্তা জি ইভান্স, জনস্বাস্থ্যের সহ অধিকর্তা ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহিম সুফি, পি ডাব্লু ডির অধীক্ষক প্রযুক্তিবিদ্ রায় শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বাহাদুর। মোট সাতজন। পরে অবশ্য নারায়নগঞ্জ স্টিমার কোম্পানির এজেন্ট এ এল গডেনকে সহযোজন করে নেওয়া হয়েছিল।"



"কুট্টিমামা, এটা কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।"

"কেন বাড়াবাড়ি কীসের?"

"তুমি বলতে চাও এসব নাম তুমি ঠিক ঠিক বলেছ? এসব তোমার মনে ছিল?"

"আলবাত ঠিক বলেছি। বিশ্বাস না হয়, ১৯২২ সালের ১৮ই অগাস্ট সে সমিতি সরকারের কাছে যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন, তা মিলিয়ে নিস। কিংবা ১৯২৩ সালের ১৬ই এপ্রিল দার্জিলিং থেকে যে সরকারি আদেশনামা গভর্নরের সচিব জে টি ডোনোভানের সাক্ষরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, তাও মিলিয়ে নিতে পার।"

"এই বিল্টু, চুপ করত। তোদের কুট্টিমামাকে বলতে দে।" কাকিমাও দেখছি কুট্টিমামার ভক্ত হয়ে পড়ছে।

"হ্যাঁ, দেখুন না দিদি। এরা সত্যি কথা বিশ্বাস করতে চায় না।"

"না, না, তুমি বলো। আমি শুনছি।"

"১৬ই অগাস্ট ১৯২১ থেকে ১৯২২ এর ৮ই অগাস্টের মধ্যে এই সমিতি সাতবার নিজেদের মধ্যে সভা করলেন, কোলকাতার 'বোস ইনস্টিটিউটে'। নানা জনের মত নিলেন, নানা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলেন। বাংলার নানা স্থান পরিভ্রমন করলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ বিষয়ে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বা হচ্ছে, তার খোঁজখবর নিলেন এবং অবশেষে সরকারের কাছে তাদের মতামত জানালেন।"

"কী সেই মতামত?"

"তাঁরা পরামর্শ দিলেন এক নতুন আইন করবার। দীর্ঘ দিন টালবাহানার পর অবশেষে ১৯৩৬ সালে আইন পাশ হল 'বঙ্গদেশীয় কচুরিপানা আইন।' সেই আইনের বলে এক স্থান থেকে অন্য কোনো স্থানে কচুরিপানার একটা টুকরোও স্থানান্তর করা নিষিদ্ধ হল। পানা বিক্রি, চাষ, এমনকী গাছ গজানো সব নিষিদ্ধ করা হল। নিজের মালিকানাধীন জলায় কচুরিপানা ধ্বংস করা বাধ্যতামূলক করা রইল। এর অন্যথা হলে শাস্তির ব্যবস্থাও হল। প্রথম অপরাধের জন্য একশো টাকা জরিমানা, অনাদায়ে একমাসের কারাদণ্ড। দ্বিতীয়বার অপরাধ ধরা পড়লে এর দ্বিগুণ জরিমানা ও কারাদণ্ড।"



"এর ফল হল কি কিছু?"

"হয়নি যে তা তো দেখতেই পাচ্ছিস। আজও দুই বাংলাতেই জলা জায়গা মানেই কচুরিপানা। আর তার ফলে মশা, মাছি, পোকামাকড়। মাছের চাষের ক্ষতি ইত্যাদি ইত্যাদি।

"একসময় এমন এক অবস্থা হয়েছিল যে ফেরি চলাচলও বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। গডেন সাহেব রিপোর্ট দিয়েছিলেন, যে একবার স্বয়ং বড়োলাট যখন জলপথে দেশ দেখতে বের হয়েছিলেন, তখন পথে তার লঞ্চ আটকে গিয়েছিল কচুরিপানার জালে। অবশেষে পানা পরিষ্কার করে তবে তাকে যেতে হয়।"

"কিন্তু একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না, ব্রেজিলেও কি পানার এমন বাড়বাড়ন্ত? তাই যদি হয়, তবে সে দেশ থেকে কি শিক্ষা নেওয়া যেত না?"

"এটাই তো আসল কথা। ব্রেজিলের গহন গভীর জঙ্গলে এ গাছ ছিল। কিন্তু এমন কিছু বাড়বাড়ন্ত ছিল না। মানুষের সামান্য ভুলে এ গাছ অন্য নিরক্ষীয় অঞ্চলে উপযুক্ত আবহাওয়া পেয়ে এমন বাড়ল যে, তার জ্বালায় আজও আমরা অস্থির। একেই বলে অবিমৃষ্যকারীতা। না বুঝে, না ভেবে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করা।

"বহু গাছ, বহু প্রাণীকে মানুষ এভাবে, না বিবেচনা করে, হয়তো ভালো হবে ভেবেই এক দেশ থেকে আর এক দেশে নিয়ে গেছে। অনেক সময়েই তার ফল ভালো হয়নি; ভালো হয়নি অস্ট্রেলিয়ায় খরগোশ নেওয়া, আমেরিকায় জিপসি মথ নেওয়া কিংবা ব্রেজিল থেকে কচুরিপানা আনা।"

রান্নাঘর থেকে মার আর্তনাদ এল, "গ্যাসে কী বসিয়েছিস রে ছোট, পুড়ে গেল যে।"



"ওমা, তাই তো," বলে কাকিমা দৌড়োলেন। পেছন থেকে মিনু বলে দিল, "গ্লাসটা চাই না মা। ফুলটা আমি ফেলেই দিলাম।"



ক্যাকটোব্লাসটিস ক্যাকটোরা

খাবার টেবিলে চলছে তুমুল তর্ক। একদিকে আমরা তিনজন। আমি, বিল্টু আর মিনু। অন্যদিকে বাবা আর কাকা।

আমরা কুট্টিমামার শিষ্য। আমাদের বক্তব্য একটাই। মানুষ তার নিজের দোষেই প্রকৃতির ক্ষতি করছে। ওই যে, ভাবনাচিন্তা না করে, এদেশ থেকে ওদেশে বিভিন্ন গাছ আর প্রাণী আমদানি করে। কাকা বললেন, "তা কেন? এই যে পটাটো চিপস খাচ্ছিস। সেই আলু যদি পর্তুগিজরা এদেশে না নিয়ে আসত, তবে খেতে পেতি? এখন তো সব রান্নাতেই আলু লাগে।"

বাবা যোগ করলেন, "আর টমাটো? কিংবা পেঁপে, পেয়ারা? সব থাকত কোথায়?"

মিনু মোটেই পেঁপের ভক্ত নয়? "পেঁপে না আনলে ভালোই হত। রোজ রোজ পেঁপে সেদ্ধ খাওয়া থেকে বাঁচতুম।"



"কিন্তু আনারস? কিংবা মর্তমান কলা?" কাকা ছাড়বার পাত্র নন। ও দুটোই মিনুর প্রিয় কিনা!

আমরা ঠিক কী উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমনি সময়

দৈববাণীর মতো কুট্টিমামার আবির্ভাব ঘটল। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতে কুট্টিমামাকে পাওয়া যায় বলেই আমরা তাকে এত ভালোবাসি।

"এই যে কুট্টি! তুই কী বুঝিয়েছিস ভাগনে ভাগনিদের? নতুন নতুন গাছপালা আমদানি করা, এক দেশ থেকে আর এক দেশে জীবজন্তু, গাছপালা নিয়ে যাওয়া নাকি মানুষের অন্যায় হয়েছে?" বাবা তাকে চেপে ধরেন।

"নাঃ, তা তো বলিনি!" কুট্টিমামার কথায় আমরা একেবারে পপাত ধরণীতলে।

"তুমি বলোনি একথা?" বিল্টু দস্তুর মতো গর্জে ওঠে। "আমাদের বলোনি কচুরিপানার কথা, খরগোশের গল্প?"

"বলেছি তো!"

"তবে?" আমরা তিনজনে একসাথেই এবার গর্জন করি।

"একথা বলিনি, নতুন নতুন গাছপালা, জীবজন্তু আমদানি করা মাত্রেই খারাপ। বলেছি না ভেবেচিন্তে আমদানি করাটা অন্যায়, ভুল।

"আসলে খারাপ করবে বলে তো কেউ এসব করে না। করে ভালো হবে ভেবেই। আমেরিকা থেকে সূর্যমুখী ফুল না নিয়ে এলে কোথায় থাকত তোদের এই 'কোলেস্টরল ফ্রি সাদা তেল।' যার লুচি দিদি এক্ষুনি ভাজতে গেল—অবশ্যই আমায় দেখে। ভুট্টা রেড ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে না আনলে তোদের পপকর্ন কোথায় পেতি?"

বাবা, কাকা, সমস্বরে বলে ওঠেন, "তাই বল! তোর ভাগনেদের বোঝা সে কথা।"

"এসব যেমন সত্যি। উলটোটাও তেমনি সত্যি।"

"তার মানে?"

"মানে খুবই সোজা। না বুঝেসুঝে জীবজন্তু , গাছপালা আমদানি করে, পৃথিবীর বহু ক্ষতিই হয়েছে। মানুষকে নাকাল হতে হয়েছে। নাজেহাল হতে হয়েছে।"



"যেমন?" কাকা জানতে চান।

"যেমন এই ক্যাক্টাসের কথা ধরুন না কেন?"

"ক্যাকটাস?"

"হ্যাঁ ক্যাকটাস। যার একটা বিশেষ প্রজাতিকে আমরা ফণীমনসা বলি।"

"ক্যাকটাস তো মরুভূমির গাছ!"

"হ্যাঁ, তা অবশ্য বলা চলে। আদতে এ গাছ হল মরুপ্রায় অঞ্চলের গাছ। যেখানে অন্য গাছ হয় না, রুক্ষ মরু অঞ্চল, সেখানে এ গাছ বেঁচে থাকে। যাই হোক, এই মনসা গাছ আমদানি করে কী দুর্ভোগই না হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার চাষিদের।"

"মনসা গাছ আমদানি করে মানে? ক্যাকটাস তো বড়োলোকেরা সখ করে ঘরে টবে সাজিয়ে রাখে। সব দেশেই রাখে। আমাদের দেশেও রাখে। আমাদের বাড়িতেই আছে। মিনুর মায়ের শখ।" কাকা জানান, "তাতে দুর্ভোগ হতে যাবে কেন?"

"না না, অমন শখের গাছ নয়। দস্তুর মতো চাষ।"

"চাষ? ফণীমনসার কেউ চাষ করে নাকি? কুট্টির যত সব অদ্ভুত কথা।" বাবা মত দেন।

"করে নয়। করত। তা নইলে অমন লাল রং পাবে কোথা থেকে?"

"মনসা গাছ থেকে লাল রং? তুমি সত্যিই পাগল।"

"মোটেই নয়। ১৮৫৭ সালের আগে মানুষ তো রঙের জন্য এসব জৈব পদার্থের ওপরই নির্ভর করত। অবশ্য অজৈব পদার্থও কিছু ছিল।"

"১৮৫৭? সে তো সিপাহি বিদ্রোহের বছর। তার সঙ্গে রঙের কী সম্পর্ক?"

"সিপাহি বিদ্রোহ নয়। বলুন, ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ। সম্পর্ক একটাই। ওই বছরেই উইলিয়াম পার্কিন নামে এক উনিশ বছরের কিশোর প্রথম রাসায়নিক উপাদান থেকে রং তৈরি করে ফেলে। সে অবশ্য আবিষ্কার করতে গিয়েছিল ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনাইন— আলকাতরা থেকে। আবিষ্কার করে ফেলল রাসায়নিক রং।"

"তার আগে এসব রং ছিল না?"

"ছিল। কিন্তু তা আসত নানা গাছপালা, জীবজন্তু বা মাটি, পাথর থেকে।"



"কীরকম?" এবার আমি জানতে চাই।

"বহু হাজার বছর ধরে মানুষ গুহার ভেতর নানা জীবজন্তুর ছবি এঁকেছে, তা তো জানিস। তার জন্য নানা রংও ব্যবহার করেছে। সে রং তারা পেত কোথা থেকে?"

"নানা ধরনের মাটি থেকে।" বিল্টু উত্তর দেয়।

"কারেক্ট। তবে সবটা নয়। নানা রঙের মাটি পাথর গুঁড়ো করে তারা রং করত। এছাড়াও নানা গাছপালা, ফুল থেকেও রং বের করতে শিখেছিল পরবর্তীকালের মানুষেরা। তারপর জানল নানা কীটপতঙ্গ মেরে তার রস দিয়ে রং করতে। আমাদের দেশে নীল চাষের সম্বন্ধে সবাই জানে। নীলদর্পণ নাটকে দীনবন্ধু মিত্র নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি লিখে রেখে গেছেন। কিন্তু কেন এই নীলের চাষ? না, রং পাবার জন্য। এ ছাড়া নীল রং পাওয়ার আর কোনো উপায় ছিল না। জামাকাপড়, বিশেষ করে পশম রং করতে দরকার পড়ত এসব রঙের। ঠিক এমনিভাবে সামুদ্রিক কাট্‌ল্‌ফিশ থেকে পাওয়া যেত সিপিয়া রং।"

"ঠিক সেইরকম ফণীমনসা গাছ থেকে লাল রং পাওয়া যেত?" আমি জানতে চাইলাম।

"সোজাসুজি ফণীমনসা থেকে নয়। বলা যায় একরকম কীট থেকে। তার নাম কচিনীল (cochineal)। তাদের বাসা ওই ফণীমনসা গাছে।

"লাল রংটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রংগুলির একটা। মানুষ এই লাল রং, বিশেষ করে গাঢ় লাল রং পাবার চেষ্টা অনেক হাজার বছর ধরে করে চলেছিল। প্রথম প্রথম এ রং আসত লাল মাটি থেকে। বিশেষতঃ লোহার খনিজ আকর হিমাটাইট থেকে, আর রেড অকার (Red ochre) থেকে। ক্রমশ আরও বহু উপায় আবিষ্কৃত হল। যেমন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এক ধরনের ঝিনুকের ভেতর যে প্রাণীটা থাকে তার থেকে এই রং পাওয়া সম্ভব হল। এই ঝিনুককে বলা হত 'নান' (knan)। আজকের প্যালেস্তাইন অঞ্চলের নামই তার থেকে হয়েছিল 'কন্যান'। কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। আরও গাঢ় লাল পাওয়া গেল ওই কচিনীল থেকে।"



"লাল রঙের এত দাম কেন?"

"কারণ বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন, লাল রং দর্শনে মানুষের হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। অ্যাড্রেনালিন হর্মোন আরও অধিক ক্ষরিত হয়। দেখবি, নানা কোম্পানির মালপত্রের খোলসে লাল রং ব্যবহারের প্রবণতা বেশি।

"মানুষের জীবনে, শুধু মানুষ কেন, প্রতিটি প্রাণীর জীবনেই রঙের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। এ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা দেখিয়েছেন হালকা গোলাপি রং মানুষের মনকে শান্ত করে। আজকাল তাই বহু দেশে জেলের দেওয়াল গোলাপি রঙের করা হয়। আবার এই একই রঙের খিদে কমানোর ক্ষমতাও আছে। কিন্তু কমলা রঙের ঠিক উলটো ব্যবহার। খিদে বাড়ায়। হলুদ রঙের আবহাওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া ভালো করে বলেও জানা গেছে।"

"সে তো বোঝা গেল। কিন্তু ঝিনুক থেকে যে লাল রং পাওয়া যায় তা মানুষ আবিষ্কার করল কীভাবে?"

"সে নিয়ে এক মজার গল্প আছে। ফিনিশীয়দের এক দেবতা ছিলেন 'মেলকার্থ'। একদিন তিনি সমুদ্রের ধারে সঙ্গী কুকুরটিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কুকুরটা, কোথাও কিছু নেই, ঢেউএ ভেসে আসা একটা ঝিনুকে দিল এক কামড়। অমনি রক্তারক্তি। দেবতা তাড়াতাড়ি তার মুখ থেকে ঝিনুকটা বের করে নিলেন। নাঃ। কাটেনি তো কোথাও। তবে? তখনই তিনি আবিষ্কার করলেন, এ ঝিনুক থেকে লাল রং পাওয়া যেতে পারে।

"এটা অবশ্য গল্প। তবে তিন ধরনের ঝিনুক থেকে এ রং নিষ্কাশন করা হত। মিউরেক্স ব্র্যান্ডারিস, মিউরেক্স ট্রাঙ্কিউলাস, আর পুর্পুরা বিমাস্টোমা। এদেরই নাম ছিল নান। এসব রং ছিল তখনকার দিনে সোনার চেয়েও দামি। মাত্র এক আউন্স রং পেতে গেলে বেশ কয়েক হাজার ঝিনুকের প্রাণ যেত। আজও মেক্সিকোতে এভাবে রং বানানো হয়। এককালে আজটেক নরপতিদের কাপড় রং করতে লক্ষ লক্ষ ঝিনুক ব্যবহৃত হত।"

"আর তোমার সেই কচিনীল?"



"সেও আজটেকদের কাহিনি—তারাই প্রথম আবিষ্কার করে এ পোকা থেকে রং পাওয়া যেতে পারে। আজটেক নরপতিদের বসন রাঙানো হত লাল রং দিয়ে। আর সেই রং আসত কচিনীল পোকা থেকে।

সুতরাং এ চাষের জন্ম মেক্সিকোয়। মেক্সিকো রুক্ষ, ঊষর দেশ। ক্যাকটাস গাছের ছড়াছড়ি। আর সেই গাছেই বাসা বাঁধে এই কচিনীল পোকারা। বৈজ্ঞানিক নাম ড্যাক্‌টাইলোপিয়াস কক্কাস (Dactylopius Coccus)। বেশ গালভরা নাম। কিন্তু আদতে পোকাগুলি মটরদানার অর্ধেক সাইজের। রং কালচে লাল। কিন্তু এরা ঢাকা থাকে একধরনের সাদাধুলোর আস্তরণে। ফলে মনে হয় এরা ধূসর রূপালি রঙের। এদের প্রজাতি তিনটি : গ্রানা ফিনা, গ্রানা সিলভেস্টার আর কক্কাস ইন্ডিকাস (Grana Fina, Grana Sylvestre, Coccus Indicus.) এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো আর বেশি রং পাওয়া যায় প্রথমটি থেকে।"

"এরা সবাই কি ফণীমনসা গাছে বাসা বাঁধে?"

"হ্যাঁ।"

"আর কোথাও পাওয়া যায় না?"

"না। আর তার কারণ, এরা ফণীমনসা গাছের রস খেয়েই বেঁচে থাকে।"

"আমাদের দেশেও তো অনেক ফণীমনসা গাছ। সেখানেও কি এসব পোকা থাকে?"

"থাকেই তো। একসময় প্রচুর ছিল। তখন দস্তুর মতো তাদের চাষ হত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নাম শুনেছিস তো?"

"সেই লর্ড ক্লাইভের কোম্পানি? যারা এদেশে ব্যাবসা করতে এসে রাজত্ব করতে শুরু করল?" আমি বলি।

"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী —রাজদণ্ড রূপে।" বিল্টুটার বেশ পড়াশুনা আছে। মনেও থাকে। আমারও এটা জানা ছিল। সময়মতো মনে পড়ল না এই যা।

"হ্যাঁ, সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কিন্তু তারা এদেশে এসেছিল কেন বল দেখি।"



"কেন? রাজত্ব করতে!"

"সে তো পরে জুটে গেল। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ব্যাবসা করা। কিন্তু কীসের ব্যাবসা?"

"কাপড়ের ব্যবসা। এ দেশ থেকে তারা সস্তায় মসলিন নিয়ে যেত।" বিল্টু বলে।

"কাপড়ের ব্যাবসা একটা অন্যতম ব্যাবসা ছিল ঠিকই, আসল ছিল দুটি আরও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। একটা মশলা—যেমন, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, গোলমরিচ, জৈত্রি, জায়ফল ইত্যাদি। আর একটা হল রং। নীল রং, লাল রং। সুতি আর পশমের কাপড় রং করতে যা দরকার। এর সঙ্গে ছিল অবশ্য নুনের ব্যাবসা।

"যাইহোক, নীল চাষ থেকে নীল রং পাওয়া যেত। আর লাল রং? তা আসত এই কচিনীল থেকে।"

"তার জন্য তাদের এদেশে আসতে হল?"

"শুধু তার জন্য তো আসেনি। আসলে এই কচিনীলের চাষ একচেটিয়া ছিল মেক্সিকোতে। আগেই বলেছি আজটেকদের কথা। মেক্সিকোতে স্পেনের প্রাধান্য। তারা একে নিয়ে এল নিজেদের ঘরের কাছে। দক্ষিণ স্পেনে আর ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে মরক্কো-স্পেনীয় সাহারা থেকে একশো তেরো কিলোমিটার দূরে উত্তর আটলান্টিকের এক দ্বীপপুঞ্জ এই ক্যানারি। এটা স্পেনের অধীনে।"

"ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ? ক্যানারি পাখি থেকে নামটা এসেছে বুঝি?" বিল্টু জানতে চায়।

"না। ওই দ্বীপের নাম থেকেই পাখির নাম এসেছে। আসলে রোমানরা ওই দ্বীপপুঞ্জের নাম দিয়েছিল 'ইনসুলাস ক্যানারিয়াস' (Insulas Canarias)। মানে কুকুরদের দ্বীপ। এক সময় সত্যিই এই দ্বীপগুলিতে প্রচুর কুকুর ছিল।

"যাইহোক, সে অন্য কথা। বলছিলাম কচিনীল নিয়ে। এছাড়াও কচিনীলের চাষ ছিল আলজিরিয়াতে আর দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে। এর কোনোটাই তো ব্রিটিশদের অধীন নয়। তাই তাদের চড়া দামে রং কিনতে হত। এদেশে এসে তারা দেখল দেশে যথেষ্ট ফনীমনসা গাছ। সুতরাং কচিনীলের চাষ করা যেতেই পারে।

"১৭৮৬ সালে মাদ্রাজ থেকে জনৈক ড. জেমস অ্যান্ডারসন এই

ব্যাবসায়ে নামার জন্য ক্যাকটাসের, মানে ফণীমনসা বা ওপুনশিয়া গাছের চাষ করার উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে। ১৭৮৭ সালে ক্যাপ্টেন জন কক্স এক চিঠিতে জানাচ্ছেন, তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে যথেষ্ট পরিমানে এ গাছ দেখেছেন। ড. অ্যান্ডারসন দেশীয় বন্য গাছ হিসাবে মনসা গাছ এনে নিজের বাগানে লাগিয়েছিলেন কচিনীলের চাষ করবেন বলে। কোম্পানি তার প্রস্তাব মেনে নিলে অর্থাৎ ক্যানারি দ্বীপ থেকে গ্রানা ফিনার বীজ নিয়ে এলে, যাতে গাছের অভাব না হয়, তাই তার এই ব্যবস্থা। অবশ্য তিনি কোম্পানির আমদানির অপেক্ষায় না থেকে, দেশীয় বন্য পোকা গ্রানা সিলভেস্টারের চাষ আগে থাকতেই শুরু করে দিয়েছিলেন।"

"তার মানে কোম্পানি সাহায্য করলই না?"

"করবে না কেন? দস্তুরমতো করেছিল। মনসা ইত্যাদি বিশেষ কিছু তখনকার দিনের বাণিজ্য-সফল গাছের চাষের জমির জন্য রাজস্ব সাধারণ জমির ষোলো ভাগের এক ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। গাছগুলির মধ্যে ছিল মালবেরি বা তুঁত গাছ, যাতে তসর, রেশমের গুটিপোকার চাষ হয়, আর ছিল ওপুনশিয়া বা মনসা গাছ। এতে হত কচিনীলের চাষ। ১৮২০ সালে এক রিপোর্টে জনৈক জি এ প্রিন্সেপ জানিয়েছেন ১৭৯৭-৯৮ সালেই বেশ ভালো পরিমান কচিনীল এদেশ থেকে রপ্তানি করা হয়েছিল। ১৮৭১ সালের এক কচিনীল সংক্রান্ত প্রতিবেদনে পঞ্জাব কৃষি দপ্তরের কমিশনার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ওয়েস (wace) হিসেবে করে দেখিয়েছেন কচিনীল চাষে একর পিছু, কম করেও নব্বুই পাউন্ড লাভ থাকে। আজকের দিনের হিসেবে তা অনেক। নিদেনপক্ষে তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা।"

"কিন্তু এই কচিনীল থেকে রং তৈরি করা হত কোথায়? এদেশেই হত?"



"এদেশেই অনেক কচিনীল প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ছিল। ভারতে যা উৎপন্ন হত। বাইরে থেকেও, মূলত মেক্সিকো আর ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ থেকেও গ্রানা ফিনা আমদানি করা হত। ১৮৭৫ থেকে ১৮৭৯ সালের মধ্যে পাঁচ বছরে কলকাতা ও বোম্বাই বন্দর দিয়ে চার লক্ষ

কিলোগ্রামেরও বেশি ফিনা আমদানি হয়েছিল। তখনকার দিনেই তার মূল্য ছিল সাড়ে বারো লাখ টাকারও বেশি।"

"তার মানে কচিনীলের ব্যবসা বেশ জমেই উঠেছিল বলো।"

"নাঃ, তেমন জমল কই? আমদানি করে কাঁচামাল এনে আর কদিন চলে? আসলে এদেশে এসে গ্রানা ফিনারা তেমন সুবিধে করতে পারল না। দেশি সিলভেস্টাররা তাদের হারিয়ে দিল। তাদের কাছে ফিনারা বাসস্থান দখলের লড়াইতে পরাজিত হল। অথচ সিলভেস্টার থেকে ফিনার এক চতুর্থাংশ মাত্র রং পাওয়া যায়। তাই ধীরে ধীরে রঙের কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রাসায়নিক রং আবিষ্কারের পর কচিনীলের ব্যবসা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।"

"ক্যাকটাস গাছগুলির কী হল?"

"রঙের প্রয়োজনে পোকা সংগ্রহ বন্ধ হলেও, তাদের বংশ বৃদ্ধি তো আর বন্ধ হবার নয়। আর এই ওপুনশিয়াই তো তাদের খাদ্য। ফলে বাংলা আর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ছিল যে মনসা গাছের জঙ্গল, তারা অচিরেই নিঃশেষ হয়ে গেল। ১৯১১ সালে আই এইচ বার্কলে তার রিপোর্টে লিখলেন, ১৭৯৫ সালের আমদানি করা বন্য কচিনীল পোকারা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে ওপুনশিয়া মোনাকান্থার ডালপালা ফলফুল মায় শেকড় অবধি নিঃশেষ করে দিয়েছিল।"

"বাঁচা গেল। নইলে সারা দেশে মনসার জঙ্গলে ভরতি হয়ে যেত। একা মিনুর আনা ক্যাকটাসেই আমরা পাগল হবার জোগাড়।" মিনু কোন বন্ধুর কাছ থেকে সুন্দর দুটো ক্যাকটাসের টব এনে পড়ার টেবিলে রেখেছে, তাই বিল্টুর এই টিপ্পনি।

"আমি মোটেই ফণীমনসা গাছ লাগাইনি। আমি যা এনেছি তার দাম জান? বিরাট দামি! চন্দ্রিমার দাদা বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছে, সুন্দর দেখতে বলে।"



"ক্যাপ্টেন ফিলিপও সুন্দর দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। হয়েছিলেন বলে অস্ট্রেলিয়ার উর্বর চাষের ছয় লক্ষ একর জমি ১৯২৫ সালেই শেষ হতে বসেছিল।"



“তার মানে? অস্ট্রেলিয়াতেও কচিনীল চাষ শুরু হয়েছিল নাকি?”

“কই আর শুরু হল। সবটাই ক্যাপ্টেন ফিলিপের নির্বুদ্ধিতা। বেচারা! ভালো করতে গিয়ে দিয়েছিল সর্বনাশ করে।”

“কীরকম?”

“তোমরা জানো অস্ট্রেলিয়ার অনেকটাই মরুভূমি। তাই সেখানে ক্যাকটাস আগে থাকতেই ছিল। কিন্তু ছিল না ওপুনশিয়া বা ফণীমনসা গাছ। যাকে ইংরেজরা ডাকে প্রিকলি পিয়ার নামে। এতে ফুল হয়, ফলও হয়। পশুখাদ্য হিসাবে এদের দাম আছে।

“অস্ট্রেলিয়ায় ভেড়া পালন এক সফল ব্যবসা। ফিলিপ সাহেব ব্রেজিলে এগাছ দেখে ভাবলেন, গাছগুলি দেখতে সুন্দর। ফুলগুলিও সুন্দর। কেটে কেটে ভেড়াকে খাওয়ানো চলবে। সঙ্গে চলবে কচিনীলের চাষ। শুধু তাই নয়। ভেড়ার খামারের বেড়াও দেওয়া যাবে কাঁটা গাছের।

“এত সব চিন্তা করেই ফিলিপ সেই সুদূর দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ওপুনশিয়া গাছ নিয়ে এলেন অস্ট্রেলিয়ায়। বেচারা ফিলিপ। তার কোনো আশাই পূর্ণ হল না।”

“কেন? কী পরিণতি হল সে গাছের?”

“তিনি ভেবেছিলেন কচিনীলের চাষ করবেন। ঘটনা হল, অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়ায় মনসা গাছ খুব মজা পেল। তারা দ্রুত, অতি দ্রুত বাড়তে লাগল। কিন্তু সে আবহাওয়ায় কচিনীলেরা একেবারেই খাপ খাওয়াতে পারল না। ভালো প্রজাতির গ্রানা ফিনারা তো নয়ই। এমনকী শ্রীলঙ্কা থেকে আমদানি করা বন্য প্রজাতির সিলভেস্টারও মার খেয়ে গেল। ফলে কচিনীলের চাষ মাথায় উঠল।

“এদিকে ভেড়ারাই বা মনসার ফুল, ফল, পাতা কত আর খাবে? অন্য দিকে ভয়াবহ গতিতে ক্যাকটাস বাড়তে শুরু করল। ক্রমশ তা চাষের জমি দখল করতে শুরু করল।



“প্রথম প্রথম চাষিরা কাঁটাগাছ উপড়ে ফেলে দিত। কিন্তু তাতে কি আর পারা যায়? যতটা উপড়ায় তার দশগুণ গতিতে গাছ বংশ বৃদ্ধি করে। তাই লাগানো হল যন্ত্র। ট্রাক্টর, বুলডোজার।

"নাঃ, তাতেও হচ্ছে না। এবার ছড়ানো হতে লাগল নানা বিষাক্ত পদার্থ। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়।

"১৯১২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার ভূমি দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি পি ডব্লু শ্যানন এক আদেশনামা জারি করে এক কমিটি গঠন করলেন—প্রিক্‌লি পিয়ার ট্রাভেলিং কমিশন। কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন টমাস হার্ভে জনস্টন। আর অপর সভ্য হলেন হেনরি ট্রায়োন।"

"কী কাজের জন্য এই কমিশন?"

"কমিশনকে বলা হল বিভিন্ন দেশে গিয়ে সেসব স্থানে কোথায় কীভাবে এই ফণীমনসা ধ্বংস করা হয়েছে, তার বিবরণ সংগ্রহ করতে। তারপর অস্ট্রেলিয়ায়, বিশেষত কুইন্সল্যান্ড প্রদেশে যেখানে এর অত্যাচার সবচেয়ে বেশি, সেখানে কীভাবে ওপুনশিয়া শেষ করা যায় তার হদিশ দিতে। আরও বলা হল, এ গাছের কোনো বাণিজ্যিক ব্যবহার করা চলে কি না তাও নির্দেশ করতে।"

"কী করল সেই কমিশন?"

"প্রচুর ঘুরল। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ ছাড়াও, শ্রীলঙ্কা, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ, স্পেন, ইতালি, জার্মানি, ইংল্যান্ড, সিরিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং প্রায় সমগ্র দক্ষিণ আর উত্তর আমেরিকা ঘুরে এ বিষয়ে অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করে ও নানা দেশে এ বিষয়ে গৃহিত ব্যবস্থাদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে ১৯১৪ সালের ২৫শে নভেম্বর কমিশন এক রিপোর্ট দাখিল করলেন। এবার সে রিপোর্টের ভিত্তিতে অনেক ব্যবস্থাও নেওয়া হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। ক্যাকটাস যেমন বাড়ছিল, তেমনি বাড়তে থাকল। ক্রমশ আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল।"

"তাহলে ক্যাকটাস অস্ট্রেলিয়া থেকে শেষ হল কীভাবে? এখন তো আর তা নেই। আমি তো দু-বছর আগেও ক্যানবেরা, সিডনি সব ঘুরে এসেছি। শুনিনি তো কোনো কথা।" বাবা যে এখনও টেবিলে বসে আছেন, কেউ খেয়ালই করিনি। কাকাও বসে, ওঠেননি।

"না, শেষ তো হল একসময়। সেটা বিশের দশকের শেষ ভাগের কথা।"

"কীভাবে?"

"ক্যাকটোব্লাসটিস ক্যাক্‌টোরা। বর্গ লেপিডোপ্টেরা। আর গোত্র পাইরালিডিড্।"

"ভালো হবে না কুট্টিমামা। ওসব গ্রিক্ আর হিব্রু বুঝি না বলে, যা খুশি তাই বলে যাবে?"

"না বৎস, গ্রিকও নয় হিব্রুও নয়। বিশুদ্ধ ল্যাটিন। এ এক ধরনের মথের নাম। নিবাস ব্রেজিলের গভীর জঙ্গল। একমাত্র খাদ্য ওপুনশিয়ার নানা প্রজাতি।

"বিংশ শতকের বিশের দশকের শেষ ভাগে অবশেষে জানা গেল, এই মথেদের শুঁয়োপোকা ব্রেজিলের জঙ্গলে ক্যাকটাসকে বাড়তে দেয় না।

"জানা মাত্রই লোক ছুটল ব্রেজিলে। মথেদের ধরে আনতে। কিংবা সঠিকভাবে বলতে গেলে তাদের ডিম আনতে। ক্যাপ্টেন ফিলিপ যত যত্ন করে ক্যাকটাস এনেছিলেন, তার চেয়ে অনেক অনেক যত্ন করে নিয়ে আসা হল ডিম। ছড়িয়ে দেওয়া হল গুণে গুণে উনিশটি জায়গায়।

"এবার অপেক্ষা দুরুদুরু বক্ষে। কী জানি কী হয়? ব্রেজিলে যারা বংশবৃদ্ধি করেছে, অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়ায় তারা বাঁচবে তো?

"নাঃ, শেষ পর্যন্ত তারা বিশ্বাসঘাতকতা করল না। যদিও যথেষ্ট পরিমাণে ডিম ফুটল না। কিন্তু যা ফুটল তাতেই বোঝা গেল এর কার্যকারীতা।

"আর পায় কে? এবার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ডিম ছড়ানো হল সারা দেশময়। দশ বছর বাদে হিসেব করে দেখা গেল মরা ক্যাকটাসেরই ওজন দাঁড়িয়েছে দেড় কোটি টন। এবার মুশকিল হল তার সদগতি করা। সবেতেই তো খরচা।

"যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ক্যাকটাস বংশ ধ্বংস হল। কত খরচ হল জানিস? সতেরো কোটি পাউন্ড। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল অস্ট্রেলিয়ার চাষিরা। বেঁচে থাক শুঁয়োপোকারা।"



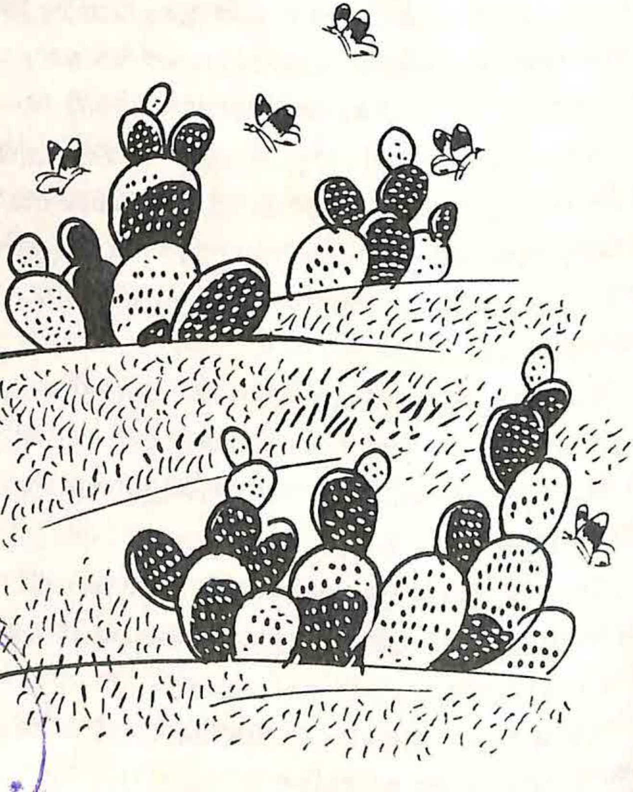
বিস্টুর ফাজলামো যায় না। "আচ্ছা কুট্টিমামা, এই ক্যাকটাস মথের কথা অস্ট্রেলিয়ানদের কে জানিয়েছিল তা তো বললে না।"

প্রায় গোটা তিরিশেক লুচির শেষটা মুখে ভরতে ভরতে কুট্টিমামা জবাব দেয়, "পৃথিবীতে একজনই আছে, যার এ বিষয়ে যোগ্যতা আছে, বুঝলি!"

"তখন তোর বয়স কত রে কুট্টি? মানে, তখনও তো তোর দিদি জন্মায়নি কিনা!"

"দাড়ান, বলছি হাতটা ধুয়ে আসি।"

সেদিনের মতো অবশ্য কুট্টিমামা নিরুদ্দেশ।





ISBN 81-86806-80-6